(*Vide Calcutta Gazette, Notification. No. 10 T Dated 10. 12 55.*)

গল্পে ইতিহাস

(তৃতীয় শ্রেণীরপাঠ্য)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি. এ. বি. টি.

এস. এন. চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

১৩২২ মূল্য ৷৵০ আনা

প্রকাশক :

শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

প্রাপ্তিস্থান :

১। এস. এন. চক্রবর্তী এণ্ড কোং
২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

২। আদর্শ লাইব্রেরী—হাবড়া

৩। দমদম পুস্তকালয়—নাগেরবাজার (দমদম)

৪। ষ্টুডেন্টস্ ষ্টোরস্—রাণাঘাট

৫। মডার্ণ বুক ডিপো—নবদ্বীপ

৬। যুগান্তর পুস্তকালয়—মেদিনীপুর

৭। ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরী—বনগাঁ

৮। স্কুল লাইব্রেরী—বসিরহাট

মুদ্রাকর—শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ

অন্নপূর্ণা প্রেস

৩৩এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা—৬

সূচীপত্র

গল্পে ইতিহাস

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ

তখনও অন্ধকার। শেষ রাত্রির আবছা আলোকে দুই পক্ষের সৈন্য তীর-ধনুক, তরবারি ও নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোর হইতেই রথী মহারথীরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইটি সাদা ঘোড়ার সুন্দর একখানা রথে আসিলেন মহাবীর অর্জুন। রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন বলিলেন—"কৃষ্ণ, রথখানি দুই সৈন্যদলের মাঝখানে রাখ, আমি একবার দুই পক্ষ ভাল করিয়া দেখিয়া লই।"

কৃষ্ণ রথখানি মধ্যখানে লইয়া গেলেন। অর্জুন দেখিলেন, পাণ্ডব পক্ষে পঞ্চপাণ্ডব ছাড়া যুযুধান, বিরাট, সাত্যকী প্রভৃতি বীরসকল, আর কুরুপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি ও দুর্যোধন সহ শতভাই কৌরব। ইহারা সকলেই জ্ঞাতি ও আত্মীয়। বন্ধু, আত্মীয়, কুটুম্বদিগকে হত্যা করিতে হইবে কেন? অর্জুন বাঁকিয়া বসিলেন, এমন যুদ্ধ করিবেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশই হিন্দুদিগের গীতা—সকল শাস্ত্রের চরম কথা।

✓তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

কৌরব-পাণ্ডব খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই। তবু কেন তাঁহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহার কারণ জানিতে হইলে এই বংশের ইতিহাস জানিতে হয়।

কুরুবংশে বিচিত্রবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। হস্তিনাপুর ছিল তাঁহার রাজধানী। বিচিত্রবীর্য অল্প বয়সে মারা যান।



তাঁহার দুই ছেলে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া পাণ্ডুই রাজা হইলেন। কিন্তু পাণ্ডুও বেশীদিন বাঁচিলেন না। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—এই পাঁচটি শিশু-পুত্র রাখিয়া অল্প বয়সেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ইঁহারাই পঞ্চপাণ্ডব। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ছিল। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ

দুর্যোধন ছিলেন ভীমের সমবয়সী। পুত্রগণ ছোট, কাজেই অন্ধ-রাজা নিজেই ভীষ্মের পরামর্শে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। দুর্যোধনদিগকে বলা হইত কৌরব।

দুর্যোধন বাল্যকাল হইতে কুটিল প্রকৃতির ছিলেন। তিনি মনে করতেন হস্তিনার সিংহাসন ন্যায্যতঃ তাঁহারই প্রাপ্য, কারণ তিনিই রাজার অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের প্রথম পুত্র। কিন্তু যুধিষ্ঠির বংশের ছেলেদের মধ্যে সকলের বড় বলিয়া তাঁহার দাবীও কম নহে। আর বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমা প্রভৃতি রাজকীয় গুণে যুধিষ্ঠির ছিলেন সকলের সেরা।

এই কারণে পাণ্ডবদিগকে দুর্যোধন একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। বাল্যকালে একবার তিনি ভীমকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং যৌবনে এক সঙ্গে মা কুন্তী সহ পঞ্চপাণ্ডবকে বারণাবতে পাঠাইয়া কৌশলে আগুনে পুড়াইয়া মারিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? নানা উপায়ে পাণ্ডবগণ আত্মরক্ষা করিয়া অনেকদিন পরে শেষে পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভার উপস্থিত হইলেন। এইখানে লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়া অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন এবং এই সূত্রেই পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িল।

তখন অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে এক নূতন রাজধানীতে রাজত্ব করিবার সুযোগ দিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ বর্তমান দিল্লীর কাছাকাছি ছিল। পাণ্ডবদের এই ঐশ্বর্য ও প্রতিষ্ঠা কিন্তু দুর্যোধনের ভাল লাগিল না। তিনি মাতুল শকুনির সহায়তায়, কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ঐশ্বর্য

সব জিতিয়া নিলেন। পাণ্ডবেরা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া বনে চলিয়া গেলেন।

নানা দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া তের বৎসর পর পাণ্ডবগণ আবার ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য ফেরত চাহিলেন। দুর্যোধন এইবার সাফ জবাব দিলেন—"একটা সূচের মাথায় যতটুকু মাটি ধরে, বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে আমি ততটুকু মাটিও দিব না।"

কাজেই এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তাঁহাদের যুদ্ধ ছাড়া আর কোন পথ রহিল না।

কুরুক্ষেত্র নামে একটা জায়গায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন রাজা দ্রুপদের ছেলে ও দ্রৌপদীর ভাই পাঞ্চাল রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন। কিন্তু পাণ্ডবদিগের দলের প্রধান যোদ্ধা ছিলেন ভীম আর অর্জুন।

কুরুপক্ষের সেনাপতি বদল হইয়াছে। প্রথম দশ দিন সেনাপতি ছিলেন মহাবীর ভীষ্ম। তাহার পর দ্রোণ, কর্ণ, শল্য প্রভৃতি পরপর সেনাপতি হইয়াছিল।

প্রথম নয় দিন দুই পক্ষই সমান সমান যুদ্ধ করিল এবং বহু সৈন্য হতাহত হইল। ভীষ্ম হইলেন মহাবীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক। অর্থাৎ একবার একটা প্রতিজ্ঞা করিলে, প্রাণ গেলেও তিনি তাহা ভাঙিতেন না। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল শিখণ্ডী নামে একজন লোক তাঁহার কাছে আসিলে তিনি অস্ত্রত্যাগ করিবেন, যুদ্ধ করিবেন না। পাণ্ডবগণ দশম দিনে শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। কাজেই ভীষ্ম আর

যুদ্ধ করিলেন না, ধনুক-বাণ ফেলিয়া দিয়া রথে বসিলেন। তখন পাণ্ডবগণের শরে তাঁহার পতন হইল।

ইহার পর সেনাপতি হইলেন আচার্য দ্রোণ। তাঁহার সেনাপতি থাকাকালেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সবচেয়ে করুণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল অভিমন্যু বধ।

অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু। বয়স মাত্র ষোল বৎসর। এই বয়সের মধ্যে সে পিতা অর্জুনের মত পরাক্রান্ত হইয়াছিল। একদিন আচার্য দ্রোণ কুরুপক্ষে চক্রব্যূহ রচনা করিলেন। অর্থাৎ সৈন্যদিগকে এমন করিয়া সাজাইলেন যেন গোল একটি চাকা এবং এই চাকার একটি মাত্র পথ। এই পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারিলে এই ব্যূহ ভাঙিয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু পথটি কোথায় ও কি কৌশলে তাহা ভেদ করা যায়, তাহা সকলে জানিতেন না। অর্জুন জানিতেন, কিন্তু তিনি অন্য দিকে যুদ্ধে ব্যস্ত। ভীম জানেন না। কিন্তু কৌশলটি অভিমন্যু জানিত। নিরুপায় হইয়া যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকেই চক্রব্যূহ ভেদ করিতে বলিলেন।

অভিমন্যু তখন একা চক্রব্যূহের মধ্যে ঢুকিয়া এমন যুদ্ধ করিল যে, কুরুপক্ষে হাহাকার পড়িয়া গেল। কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, কোন বীরই তাহার বাণের কাছে দাঁড়াইতে পারিলেন না। তখন দুর্যোধনের আদেশে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও বৃহদ্বল—এই ছয়জন তাহাকে একসঙ্গে আক্রমণ করিলেন আর চক্রব্যূহের দুয়ারে রহিলেন জয়দ্রথ—এই সপ্তরথীর যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইল।

তারপর আচার্য দ্রোণকেও কৌশলে বধ করা হইল। দ্রোণের প্রিয় পুত্র অশ্বত্থামা মরিয়াছে এই খবর দ্রোণকে জানান হইল। দ্রোণ বিশ্বাস করিলেন না। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তখন—"অশ্বত্থামা হতঃ"—এই কথাটি জোরে এবং "ইতি গজঃ"—এই কথাটি আস্তে বলিলেন। সত্যই অশ্বত্থামা নামে একটা হাতী মরিয়াছিল। দ্রোণ কিন্তু 'অশ্বত্থামা হতঃ'—এটুকু শুনিয়াই অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তাঁহার শিরচ্ছেদ করিলেন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন।

মহাবীর কর্ণও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে হত হইলেন। পূর্ব অভিশাপ মত শ্রেষ্ঠ যুদ্ধের দিনে ধরণী তাঁহার রথচক্র গ্রাস করিল। অর্থাৎ রথের চাকা মাটিতে বসিয়া গেল এবং তিনি সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ ভুলিয়া গেলেন।

কাজেই শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন হারিয়া গেলেন এবং এইভাবে দ্রোণ, কর্ণ, শকুনি, শল্য, দুঃশাসন প্রভৃতি সকলেই একে একে নিহত হইলেন। মোট আঠার দিনের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য মরিল।

দুর্যোধন দ্বৈপায়ন নামে একটা হ্রদে লুকাইয়াছিলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। তারপর ভীমের সঙ্গে তাঁহার ভয়ংকর যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধ ছিল গদাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনের ঊরু ভাঙ্গিয়া দিলেন।

এইভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইল। কুরু ও পাণ্ডব বংশের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ছাড়া আর একজন পুরুষও বাঁচিয়া রহিলেন না।

প্রশ্ন

১। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? কুরু ও পাণ্ডব কাহাদের বলে? ২। গীতা কি? ৩। কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের ঘটনাটি বল। ৪। ভীষ্ম অভি ক ভাবে নিহত হইয়াছিলেন?

বুদ্ধদেবের কাহিনী

রাজপুত্র রথে চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। হঠাৎ সারথিকে বলিয়া উঠিলেন—"ছন্দক, দেখ দেখ, কি রকম জানোয়ার।"



ছন্দক হাসিয়া কহিল, "জানোয়ার না কুমার, মানুষ। বয়স হইয়াছে, বৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অমন দেখায়।" পাকা চুল, চামড়া ঢিলা, দাঁত নাই, একেবারে নুইয়া পড়িয়াছে। ইহার নাম

জরা। রাজকুমার অবাক্ হইয়া গেলেন—"মানুষ এমন হইবে কেন?" ছন্দক বলিল—"বয়সে লোকে বৃদ্ধ হয়। সকলেই হয়। একদিন আপনিও হইবেন, আমিও হইব।"

"সেকি? এই বয়স—এই যৌবন থাকিবে না?" রাজকুমার সেদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

আর একদিন অমনি রথে ভ্রমণের সময় রাজকুমার পথের পাশে রোগা শরীর একটি লোককে দেখিলেন। মাটিতে পড়িয়া লোকটি উঃ-আঃ বলিয়া কাতর শব্দ করিতেছে। ছন্দক বলিল—"মানুষটির অসুখ হইয়াছে। শরীর ত রোগের বাসা। রোগ সব সময়েই মানুষের হইতে পারে।" শুনিয়া রাজকুমারের মুখ কালো হইয়া গেল।

আর একদিন রাজকুমার দেখিলেন, একটি মানুষকে খাটিয়ায় করিয়া সকলে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর পিছনে পিছনে অনেকে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে। ছন্দক বলিল—"লোকটি মারা গিয়াছে রাজকুমার। ইহাই সমস্ত প্রাণীর শেষ অবস্থা। জন্মিলে সকলকেই মরিতে হয়।"

রাজকুমারের মনে ভাবনা হইল; তাহা হইলে তিনিও একদিন মরিবেন। এই সংসারে তবে উপায় কি!

পরদিন এমনি ভ্রমণের সময় গেরুয়া-পরা জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসীকে দেখিলেন। ছন্দক বলিল—"ইনি সন্ন্যাসী। অসার সংসারের বন্ধন কাটাইয়া ইনি অমৃতের সন্ধানে, মুক্তির সন্ধানে গিয়াছেন।"

রাজকুমার ভাবিলেন, তবে জরা, ব্যাধি হইতে মুক্তি

পাওয়া সম্ভব এবং তাহা হইলে তাহাকেও সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। রাজকুমার সত্যই সংসার ত্যাগ করিলেন।

তারপর ?

পরের কথা পরে, এখন আগের কথা শোন। রাজকুমার কে, সেই কথা শোন আগে।

আমাদের বাংলাদেশের প্রায় সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়েব গায়ে কপিলাবস্তু নামে এক রাজ্য ছিল। দুই চার শত বৎসর নয়, সেটা প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। শাক্য-বংশের রাজারা তখন কপিলাবস্তুতে রাজত্ব করিতেন। শুদ্ধোদন একজন শাক্য রাজা। মহামায়া ও মহাপ্রজাবতী নামে দুই বোন, তাঁহার দুই রাণী। মহামায়ার সন্তান হইবে। রাজা দুই বোনকেই বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু বাড়ী পর্যন্ত তাঁহারা যাইতে পারিলেন না। লুম্বিনী নামে একটা গ্রামে মহামায়ার এক ছেলে হইল।

সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। আকাশে আর মাটিতে দুই চাঁদ যেন একসঙ্গে দেখা দিল।

মহামায়া কিন্তু বাঁচিলেন না। বোন মহাপ্রজাবতীর কোলে ছেলেকে দিয়া চিরদিনের জন্য চোখ বুজিলেন। ছেলেটির নাম হইল সিদ্ধার্থ। কেহ কেহ গৌতমও ডাকিত।

এক সন্ন্যাসী একদিন আসিয়া বলিলেন যে, এই ছেলে মহা-ভাগ্যবান। কপালে রাজতিলক, যদি সংসারে থাকে তবে অধিরাজ বা রাজচক্রবর্তী হইবে, আর যদি সংসার ছাড়িয়া যায় তবে যতিরাজ অর্থাৎ খুব বড় সন্ন্যাসী হইবে।

বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন ভয় পাইয়া গেলেন ; ছেলেকে আর বাহির হইতে দেন না। নানা ভোগবিলাসে, খেলায়, আনন্দে ভুলাইয়া রাখেন।

সিদ্ধার্থ লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলেন ; কিন্তু সব সময় যেন কিসের এক ভাবনা তাঁহার মনে আসিত—খানিকটা উদাস হইয়া যাইতেন। রাজা তাড়াতাড়ি কুমারকে গোপা নামে একটি খুব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। তখন সিদ্ধার্থের বয়স মাত্র ষোল বৎসর।

দিন আনন্দে যাইতেছিল। সিদ্ধার্থের একটি পুত্র হইল ; নাম রাখা হইল রাহুল। এই সময়ে একদিন তাঁহার সারথি ছন্দককে লইয়া সিদ্ধার্থ নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং পথে এক বৃদ্ধ মানুষ দেখিলেন। তারপর একে একে রোগী, মৃত ও সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইলেন। এই সব কথা আগে পড়িয়াছ।

সিদ্ধার্থ একদিন গভীর রাত্রে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বৈশালী ও রাজগৃহে গিয়া তিনি অনেক শাস্ত্র পড়িলেন, অনেক তপস্যা করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। শেষে গেলেন গয়ায়। নৈরঞ্জনা নদীতীরে একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া তিনি গভীর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। এই স্থানেরই নাম পরে বুদ্ধগয়া হইয়াছে।

অনাহারে ও কঠিন তপস্যায় একদিন তিনি খুব কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন সুজাতা নামে একটি গ্রাম্য বালিকা তাঁহাকে বনদেবতা মনে করিয়া তাহার মানত সার্থক হইল মনে করিল এবং তাঁহাকে পূজা করিয়া কিছুটা পায়স খাইতে দিল। তাহা

খাইয়া বল লাভ করিয়া তিনি মহাতপস্যায় বসিলেন। এইবার তাঁহার বোধি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ হইল। এইবার তিনি হইলেন বুদ্ধ।

তিনি তারপর তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতে গেলেন কাশী। কাশীর উত্তরে মৃগদাব নামক একটা জায়গায় তিনি ধর্মপ্রচার কারতে লাগিলেন। ইহাই পরে সারনাথ নামে খ্যাত হইয়াছে।

তাঁহার ধর্মমত খুব সরল। মানুষ যেমন কর্ম করে, তেমন ফল পায়। ভাল কাজের ফল ভাল, মন্দ কাজে মন্দ ফল। কাজেই ক্ষমা, দয়া, প্রীতি, অহিংসা প্রভৃতির গুণগুলি সকলে চর্চা করিলে সর্বদাই ভাল হইবে। অহিংসা জীবের পরম ধর্ম। মানুষের মনে লোভ ও তৃষ্ণা আছে বলিয়াই সে হিংসা করে।

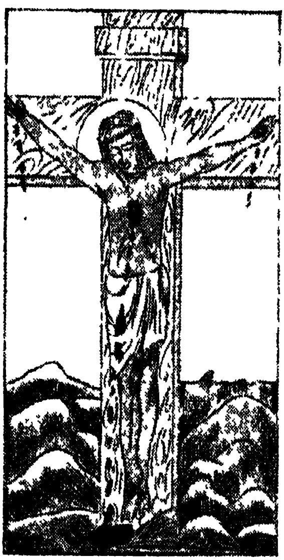
এই ধর্ম সাধারণ মানুষের হৃদয়স্পর্শ করিল। দলে দলে লোকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। অল্প সময়েই বৌদ্ধধর্ম সারা ভারত ছাইয়া ফেলিল। এইভাবে প্রায় ৪৫ বৎসর ধর্মমত প্রচার করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব কুশীনগরে মহাপ্রয়াণ করেন।

প্রশ্ন

১। বুদ্ধদেবের আগের নাম ও পিতামাতার নাম বল।
২। তিনি সন্ন্যাসী হইলেন কেন? তিনি কি কি দেখিয়াছিলেন?
৩। একজন সন্ন্যাসী কি বলিয়াছিলেন?
৪। সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় কোথায় গেলেন?
৫। বোধিলাভের ইতিহাস বল।
৬। বুদ্ধদেবের উপদেশ কি লিখ।
৭। নিম্নলিখিত লোকের বা বিষয়গুলির সম্পর্কে কি জান?
লুম্বিনী, শুদ্ধোদন, ছন্দক, গোপা, রাহুল, সুজাতা, সারনাথ

যীশুখ্রীষ্টের কাহিনী

জুড়িয়ার তিনজন বৃদ্ধ জ্ঞানী আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিলেন। প্রাচ্য দেশের মহাজ্ঞানী এই তিনজন বৃদ্ধ বিচার করিয়া ঠিক করিলেন যে, ইহুদীদিগের রাজা জন্মগ্রহণ



করিবেন। তাঁহারা উটের পিঠে বহু মূল্যবান উপহার সম্ভার চাপাইয়া ঐ নক্ষত্র অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। নক্ষত্র এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেটা একটা আস্তাবল। তাঁহারা সেই আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া মায়ের কোলে ও সদ্যজাত শিশুকে দে পাইলেন এবং তাহাকেই ই দিগের রাজা বলিয়া স উপহার দিয়া বন্দনা করিয়া গেলেন।

এই শিশুটি ছিলেন এক ছুতোর মিস্ত্রীর পুত্র। যোসেফ নামে এক ছুতোর মেরী নামে তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া জেরুসালেম মহানগরে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী গ্যালিলি প্রদেশের নেজারথ গ্রামে। মেরী সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। কাজেই জেরু-সালেম পর্যন্ত তাঁহার যাওয়া সম্ভব হইল না। পথে বেথেলহেম

নামক একটা গ্রামে তাহারা আসিয়া পড়িলেন এবং অন্য জায়গা না পাইয়া একটা ঘোড়ার আস্তাবলে আশ্রয় লইলেন। এই ঘোড়ার আস্তাবলে জন্ম নিলেন ইহুদীদের রাজা ও পরিত্রাতা মহাত্মা যীশু।

আরবদেশের কাছাকাছি এশিয়ার একটি ক্ষুদ্ররাজ্য প্যালেষ্টাইন। এইখানেই ইহুদীরা প্রবল, কিন্তু দেশটি তখন রোমান শাসকদিগের অধীনে। বড়লোক ও ধর্মযাজকদের তখন অখণ্ড প্রতাপ।

যীশুর এক জ্ঞাতি ভাই ছিলেন, নাম জন। জন খুব ধার্মিক লোক। বহুলোকে তাহার উপদেশ শুনিতে আসিত। প্যালেষ্টাইনে জর্ডন নামে একটি নদী আছে। আমাদের গঙ্গার মত জর্ডন ইহুদীদের কাছে পবিত্র। সেই নদীর জলে স্নান করাইয়া জন লোকদিগকে দীক্ষা দিতেন। যীশু জনের ভক্ত স' া এইখানে সাধনা আরম্ভ করেন। এমন সময় ইহুদী প্র. জকদিগের চক্রান্তে জনকে ধরিয়া নিয়া রাজদ্রোহী ব. যোগে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। জনের অন্যান্য শিষ্যের মত শুও পলাইয়া যান।

ইহার পর অনেকদিন যীশুর সন্ধান পাওয়া যায় না।

পরে ৩০ বৎসর বয়সে যীশু ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহার ধর্মের বাণী ছিল বুদ্ধদেবের বাণীর মত উদার ও সরল। কাজেই হাজার হাজার লোক তাঁহার অনুগত হইতে লাগিল। তখন ইহুদীদের মধ্যে শ্রেণীবোধ ছিল প্রবল। যীশু ঘোষণা করিলেন যে, ঈশ্বর হইতেছেন আমাদের সকলের পিতা। কাজেই

দরিদ্রদিগের প্রতি ঈশ্বর বেশী দয়ালু। একটা সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি উটের যাওয়া সম্ভব হয়ত হইতে পারে—কিন্তু ধনী-দের স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয়। যাহারা গরীব অথচ সজ্জন, স্বর্গ-রাজ্য কেবল তাহাদের জন্য। তখনকার প্রচলিত উপদেশ ছিল —বন্ধুকে ভালবাসিবে, ক্ষমা করিবে, কিন্তু শত্রুকে ঘৃণা করিবে। যীশু বলিলেন যে, শত্রুকেও ভালবাসিবে, ক্ষমা করিবে। কেহ একগালে চড় মারিলে আর একগাল পাতিয়া দিবে। পাপকে ঘৃণা করিলেও পাপীকে ঘৃণা করিবে না। এইসব উপদেশগুলি বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট নামক অংশে দেওয়া আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যীশু ছুতোরের ছেলে। তাহার এতটা খ্যাতি ও প্রতাপ ধনী ও উচ্চশ্রেণীর মানুষ বরদাস্ত করিবে কেন? তাহারা যীশুকে জব্দ করিবার ফিকির খুঁজিতে লাগিল।

এই সময়ে যীশুর ভক্তগণ প্রচার করিল যে যীশু হইতেছেন ক্রাইস্ট অর্থাৎ পরিত্রাতা। ইহাতে ইহুদী পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায় একবারে আগুন হইয়া গেল। এমন সময় ধর্ম-প্রচারের জন্য যীশু জেরুসালেমে আসিলেন।

ধর্ম মন্দিরের সম্মুখে নানা রকমের জুয়াখেলা ও ঠকাইবার ব্যবস্থা ছিল। যীশুর শিষ্যরা ইহা ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহাতে বড় বড় ব্যবসায়ীরাও যীশুর উপর চটিয়া তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করিল।

যীশুর বারজন প্রধান শিষ্য ছিল। ইহাদের একজনের নাম জুড়াস। এই ষড়যন্ত্রের লোকেরা তাহাকে অনেক টাকা দিয়া

হাত করিল এবং তাহার সহায়তায় যীশুকে বন্দী করিয়া চালান দিল।

রাজদ্রোহের অপরাধে যীশুর বিচার হইল। বিচারে বোঝা গেল যীশু নিরপরাধ ; কিন্তু রোমান শাসক তাঁহাদের ধনী ও অভিজাত প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্য যীশুর প্রাণদণ্ড দিলেন।

শহরের বাহিরে একটা ক্রুশে হাত পা বাঁধিয়া পেরেক ঠুকিয়া যীশুকে হত্যা করা হইল ; কিন্তু এমন সময়েও করুণার অবতার যীশু শত্রুদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন না এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন—"হে ঈশ্বর, ইহারা কী অপরাধ করিতেছে জানে না, ইহাদের তুমি ক্ষমা করিও।"

এইজন্যই ক্রুসচিহ্ন খৃষ্টানদের নিকট পবিত্র এবং সারা বিশ্বে সেবা ও প্রেমের প্রতীক। আর মনে রাখিও, যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর পর হইতেই পৃথিবীতে খ্রীষ্টাব্দ নামে ইংরেজী বৎসর গণনা আরম্ভ করা হয়।

প্রশ্ন

১। যীশু কোথায় জন্মিয়াছিলেন ? তাহার বাবা-মায়ের নাম কি ?

২। তিনজন জ্ঞানী কোথাকার লোক, ছিলেন তাঁহারা কি করিয়াছিলেন ?

৩। 'জীন' সম্বন্ধে কি জান ?

৪। যীশুর ধর্ম্মমত কি ছিল এবং তিনি

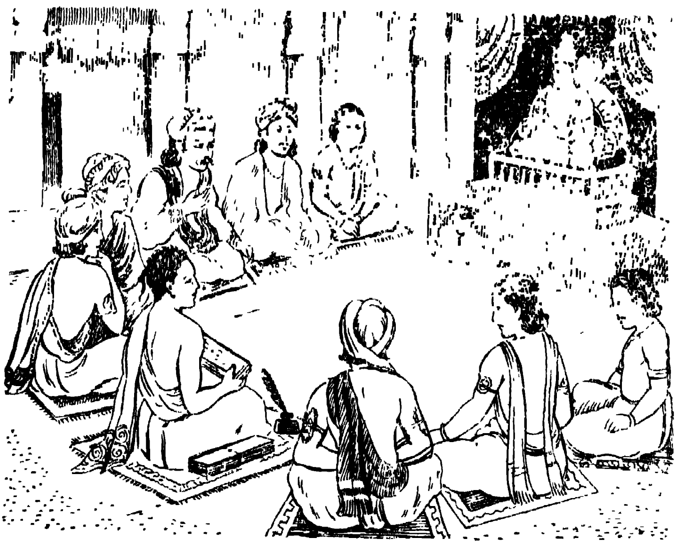
৫। যীশুর মৃত্যুদণ্ড হইল কেন ? কে

৬। 'ক্রুশ' কি ও কেন প্রসিদ্ধ ?

৭। খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইল কখন ও কেন

কালিদাসের কাহিনী

রাত্রির শেষ প্রহরে একজন সুন্দর যুবক একটি বাড়ীর বন্ধ দরজায় আঘাত করিতেছিলেন—"দুয়ার খোল, দুয়ার খোল—অস্তি কশ্চিৎ বাগ্ বিশেষঃ অর্থাৎ বিশেষ একটা কথা আছে"



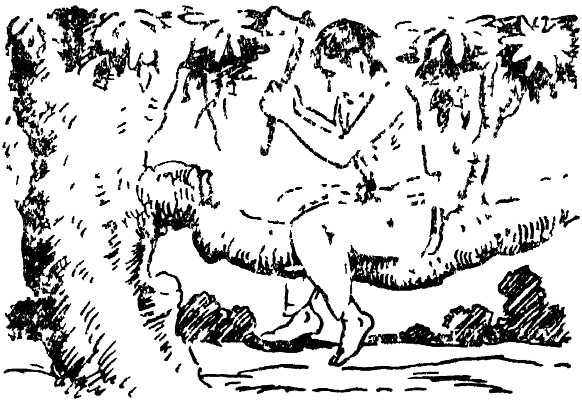
ভিতর হইতে একটি মেয়েলী কণ্ঠের উত্তর হইল—"না, খুলব না। যদি ঐ কথার প্রতিটি শব্দ দিয়া এক একটি কাব্য লিখিয়া আনিতে পার, তবেই খুলিব।"

যুবকটি দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

একটি নদীর তীরে নির্জন কুটির বানাইয়া যুবকটি এক মনে কাব্য রচনা করিতে লাগিলেন।

তখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি লইয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। শকদিগকে ভারত সীমান্ত হইতে দূরে তাড়াইয়া দিয়া তিনি 'শকারি' আখ্যাও পাইয়াছেন। উজ্জয়িনীতে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি নবরত্নের সভা বসাইলেন। ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত, জ্যোতিষী, আলঙ্কারিক, কবি প্রভৃতিকে আনাইয়া নিজের সভার শোভা বাড়াইতে লাগিলেন।

গুণগ্রাহী বিক্রমাদিত্য একদা এই তরুণের কাব্য শুনিয়া নবরত্ন সভায় প্রথম আসন দান করিলেন। এখনও পৃথিবীর



কালিদাস গাছে বসিয়া ডাল কাটিতেছে

কবিদের আসনে ইহার স্থান প্রথম হইয়া আছে। বলতো, কি এই কবির নাম? কালিদাস—মহাকবি কালিদাস। তিনি সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছিল, শোন—

কালিদাস আগে মূর্খ ছিলেন, মহামূর্খ। একদিন তিনি রাস্তার পাশে একটা গাছে উঠিয়া ডাল কাটিতেছিলেন। যে-ডালে বসিয়াছিলেন সেই ডালই কাটিতেছিলেন। তখন পথ

দিয়া একদল পণ্ডিত খুব গরম গরম কথা বলিতে বলিতে যাইতে ছিলেন। তাঁহারা এমন রাগিয়াছিলেন যে, শত্রুকে হাতের কাছে পাইলে হত্যা করিয়া ফেলেন। একজনের নজর কালিদাসের দিকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে পরামর্শ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি ঠাকুর?"

কালিদাস ছিলেন ব্রাহ্মণ ও সুদর্শন; তিনি সুমধুরস্বরে বলিলেন—"কালিদাস।" তাঁহারা একটু আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, কালিদাস মহামূর্খ—কাজেই খুশী হইয়া উহাকে ভদ্র সাজাইয়া লইয়া রাজসভায় চলিলেন।

সে দেশের রাজকন্যা ছিলেন মহাবিদুষী। তাঁহার প্রতিজ্ঞা এই ছিল যে, যে লোক তাঁহাকে তর্কে ও বিচারে হারাইতে পারিবে, সে হইবে তাঁহার স্বামী। নানা দেশ হইতে কত পণ্ডিত ও বিদ্বান আসিল কিন্তু কেহই তাঁহাকে হারাইতে পারিল না।

রাজসভায় গিয়া সেই ক্রুদ্ধ পণ্ডিতের দল বলিলেন যে, এই মহাপণ্ডিত শ্রীকালিদাস বিচার করিবেন। কিন্তু ইনি মৌনী অর্থাৎ এখন মুখে কোন কথা কহিবেন না, ইশারায় বিচার করিবেন। কালিদাস অতি সুদর্শন ও কান্তিমান যুবক। রাজকন্যা ইশারায় বিচার করিতে রাজী হইয়া গেলেন।

রাজকন্যা চতুর্দিকে হাত ঘুরাইয়া একবার দুইটি আঙ্গুল এবং একবার একটি আঙ্গুল দেখাইলেন।

কালিদাসও কি ভাবিয়া একটি আঙ্গুল তুলিলেন।

রাজকন্যা হাসিয়া মাথা নিচু করিলেন। উত্তর ঠিক হইয়াছে বোঝা গেল। রাজকন্যা ইশারায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা এক, না দুই? কালিদাস একটি আঙ্গুল দেখাইয়া দিলেন। রাজকন্যা বুঝিলেন, ঈশ্বর এক।

এই ভাবে আরও কয়েকটি প্রশ্নের পর কালিদাসের জয় হইল। কাজেই মহাসমারোহে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের রাত্রে উপহার দ্রব্য বহন করিয়া কতকগুলি উট আসিয়াছিল। কালিদাস বেশি উট দেখেন নাই। তাই আনন্দে বলিয়া ফেলিলেন—"উট্র"। বিদুষী রাজকন্যার কানে অশুদ্ধ কথাটি খট করিয়া বাজিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলিলে?" কালিদাস থতমত খাইয়া বলিলেন—"উট্র"।

সহসা রাজকন্যার মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িল। তিনি বুঝিয়া ফেলিলেন, পণ্ডিতেরা ছল করিয়া এক মহামূর্খের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি কালিদাসকে তাড়াইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

কালিদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চলিতে চলিতে চমৎকার একটা সরোবর দেখিতে পাইলেন। সরোবরে কেমন জল, কত সাদা পদ্ম ফুটিয়াছে, কেমন জ্যোৎস্না রাত্রি! কালিদাস মনে করিলেন এই জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবেন। কিন্তু এমন সুন্দর পৃথিবী হইতে কে মরিতে চায়? দুই চোখে জল লইয়া কালিদাস বলিলেন—"মা সরস্বতী, তুমি এজন্মে বিদ্যা দিলে না, আর জন্মে দিও।"

সেইটি ছিল সরস্বতী কুণ্ড। কালিদাসের প্রার্থনায় দেবী তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—"পুত্র, তুমি মরিওনা, আমি বর দিতেছি, এই জীবনেই তুমি পণ্ডিত হইবে, মহাকবি হইবে।"

সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস এই বর পাইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার দুয়ারে গিয়া কড়া নাড়িলেন—"অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ—দুয়ার খোল।" উত্তরে রাজকন্যা কি বলিয়াছিলেন তাহাও জান।

সত্যই কালিদাস—অস্তি, কশ্চিৎ, বাগ, বিশেষঃ—এই চারিটি শব্দ দিয়া চারিটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

তাহার রচিত কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ ও ঋতুসংহার কাব্য যথাক্রমে ঐ শব্দগুলি দিয়া সুরু হইয়াছে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক পৃথিবী-বিখ্যাত। ইহা ছাড়াও তাহার অন্যান্য রচনা আছে।

তোমাদের মনে হইতেছে—রাজকন্যার কি হইল? কি আর হইবে? একদিন কালিদাসের নাম ও খ্যাতির কথা তাহার কানে উঠিল। তিনি নিজে তাহার কাব্য পড়িলেন। তারপর আসিয়া দেখিলেন মহাকবি কালিদাস তাঁহারই স্বামী কালিদাস।

প্রশ্ন

১। কালিদাস কে ছিলেন? তাহাকে মহাকবি বলা হয় কেন?

২। রাজকন্যা জব্দ হইলেন কি ভাবে?

৩। কালিদাস কি ভাবে সরস্বতীর বর পাইলেন?

৪। কালিদাস কি কি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন?

৫। কালিদাস কোন্ রাজার সভাকবি ছিলেন?

৬। কালিদাসের কাহিনীটি বল।

হজরত মুহম্মদের কাহিনী

পৃথিবীর বড় ধর্মগুলির মধ্যে একমাত্র হিন্দুধর্ম ছাড়া আর সকল ধর্মই কোন না কোন মহাপুরুষের সৃষ্টি। বুদ্ধদেব বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার করেন। যীশুখ্রীষ্ট খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। এই দুই জনের কথা তোমরা শুনিয়াছ। এবার ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহম্মদের কাহিনী বলিতেছি, শুন।

যীশুর দেশ ছিল প্যালেষ্টাইন। তাহার দক্ষিণে আরব দেশ। আরব দেশে সব জায়গায় লোক বাস করিতে পারে না, কারণ অনেকটা মরুভূমি। আরবের রাজধানী মক্কা। মক্কাতেই অধিকাংশ ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবার বাস করেন।

যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর ৫৭১ বৎসর পর এই মক্কাতে এক বেশ বংশে হজরত মুহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। মুহম্মদের পিতা আবদুল্লাহ্ মুহম্মদের ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন আগে মারা যান। আবদুল্লাহ্ তখন সিরিয়া হইতে বাণিজ্য করিয়া ফিরিতেছিলেন, পথে মদিনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কাজেই পিতামহ আবদুল মোত্তালেব পৌত্রের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তখন আরবের ভদ্রবংশীয়া মহিলারা সন্তানদের স্তন্য দান করিত না। বেদুইন রমণীরা মক্কায় আসিয়া দুগ্ধপোষ্য ছোটদের লইয়া যাইত এবং মাসিক টাকা লইয়া তাহাদিগকে লালন-পালন করিত। মুহম্মদকে পালন করিত হালিমা নামে এক বেদুইন রমণী।

মুহম্মদ বাল্যকাল হইতেই ধীর ও চিন্তাশীল ছিলেন। খেলাধূলা করিবার ফাঁকে ফাঁকে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া

যাইতেন। এই ভাবে পাঁচ বৎসর ধাত্রী-মার কাছে থাকিয়া মুহম্মদ মক্কাতে আপন মায়ের কাছে ফিরিয়া যান।

মুহম্মদের মায়ের নাম ছিল আমিনা। পাঁচ বৎসর পর ছেলেকে পাইয়া আমিনা হাতে চাঁদ পাইলেন। ইহার পর বৎসর তিনি ছেলেকে লইয়া মদিনায় স্বামীর কবরে ফুল দিতে গেলেন। মদিনা হইতে ফিরিবার পথে হঠাৎ আমিনার অসুখ হইল এবং পথে আবওয়া নামক একটা গ্রামে আমিনা মারা গেলেন। জন্মের আগে বাপ হারাইয়া ছিলেন, এবার হজরত ছয় বৎসর বয়সে মাকে হারাইলেন।

তাঁহার স্নেহময় দাদু আবদুল মোত্তালেবও বেশীদিন বাঁচিলেন না। আট বৎসর বয়সে মুহম্মদের কাকারা ছাড়া আর কোন নিকট আত্মীয় তাঁহার রহিলেন না।

লেখাপড়া আর তেমন হইল না। বড় কাকা আবুতালেবের সঙ্গে শিশুকাল হইতেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে শিখিলেন। বিস্তীর্ণ মরুভূমি পার হইয়া তিনি কাকার সঙ্গে সিরিয়ায় বাণিজ্য করিতে যাইতেন।

আরবেরা দুর্ধর্ষ জাতি। কথায় কথায় তাহারা হানাহানি মারামারি করিত। জীবন মরণের কোন পরোয়াই তাহারা করিত না। মাঝে মাঝে বেশ বড় রকমের যুদ্ধ হইত। ফেজার যুদ্ধ একটি বড় যুদ্ধ। মুহম্মদের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং কাকাদের সঙ্গে তিনিও এই যুদ্ধে যোগদান করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলিতে থাকে।

এই যুদ্ধের রক্তপাত, হিংসা, বর্বরতা দেখিয়া মানুষের জন্য বিশেষ করিয়া স্বজাতির জন্য তাহার মন কাঁদিয়া উঠে। যুদ্ধের শেষে কাকাদের সহিত মিলিয়া আরবদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি এক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

আর্থিক অবস্থা তাঁহাদের ভাল ছিল না। এই সময় হজরত খাজিদা বিবি নামে এক ধনী মহিলার চাকরি গ্রহণ করেন। খাজিদা ছিলেন বিধবা ; তাহার স্বামীর একটি কারবার ছিল। কোন বিশ্বস্ত লোক না হইলে এই কারবার নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল বলিয়া, অনেক দেখিয়া শুনিয়া তিনি মুহম্মদকে কাজে বহাল করেন। পরে মুহম্মদের চরিত্র ও গুণাবলী দেখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া ফেলেন।

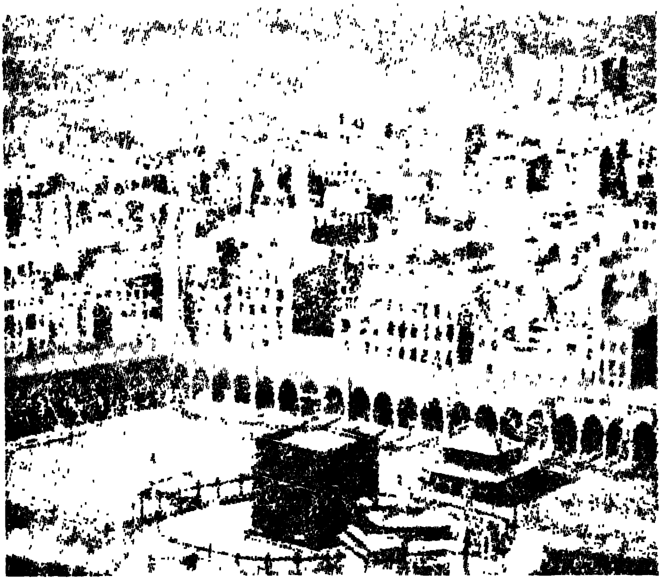
এই বিবাহে মুহম্মদের অর্থকষ্ট ঘুচিল। এবার তিনি সারা মন প্রাণ দিয়া সাধনা করিতে লাগিলেন। মক্কার অদূরে হেরা পর্বত। এইখানে তিনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এই ধর্ম-চর্চায় আরও বছর পনর কাটিয়া গেল। শেষে একদিন স্বর্গীয় দূত ফেরেস্তা জিব্রাইল তাঁহাকে দেখা দিয়া কোরাণের ছুরা বা মন্ত্র দান করিলেন। হজরত জানিলেন যে তিনি রসুল বা পয়গম্বর। তাহার কণ্ঠে কোরাণ জন্মগ্রহণ করিল। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর।

তখন আরবগণ পৌত্তলিক ও মূর্তি-পূজারী ছিল। মক্কার কাবার মন্দিরে বহু মূর্তি থাকিত। হজরত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, খোদা বা ঈশ্বর এক ও নিরাকার এবং হজরত

নিজে খোদার প্রেরিত পুরুষ। ঈশ্বর তাঁহার মুখ দিয়া ধর্মের মূল কথাগুলি দুনিয়াকে জানাইতেছেন।

ইহাতে অভিজাত, ধনী পুরোহিত আরবগণ অসন্তুষ্ট হইল। ক্রমে মুহম্মদের দলও বাড়িল। শেষে ক্রুদ্ধ আরবদের হাত



কাবা শরীফের দৃশ্য

হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তিনি মক্কা হইতে মদিনায় পলাইয়া গেলেন।

তখন হজরতের বয়স ৫২ বৎসর। তাঁহার মদিনা গমনের কাল এই ৬২২ খৃষ্টাব্দ হইতেই মুসলমানী হিজরী সন গণনা আরম্ভ করা হয়।

মদিনার লোকে তাঁহার ধর্ম সহজে গ্রহণ করিল। তখন মদিনার সব মুসলমান একত্র হইয়া মক্কা আক্রমণ করিল। মক্কার পৌত্তলিকদিগের সহিত মুসলমানদের ভীষণ যুদ্ধ হইল। কিন্তু এইবার মুসলমানদের জয় হইল। হজরত মক্কায় প্রবেশ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে ইসলামধর্ম সমগ্র আরবে ছড়াইয়া পড়িল।

হজরত কিন্তু মক্কায় বেশি থাকিতেন না। ৬২ বৎসর বয়সে মদিনাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুসলমান ধর্মের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সমগ্র আরব দেশকে এক সূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছিল এবং এক সময় মুসলমানগণ বিশ্বজয়ী হইয়াছিল।

প্রশ্ন

১। হজরত মুহম্মদ কোন্ ধর্মের প্রবর্তক? অন্যান্য কোন্ ধর্ম প্রবর্তকদের নাম জান?

২। হজরত মুহম্মদের জীবন-কাহিনী বল।

৩। হিজরা ও খৃষ্টাব্দ কাহাকে বলে?

৪। হজরতের কোথায় জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছিল?

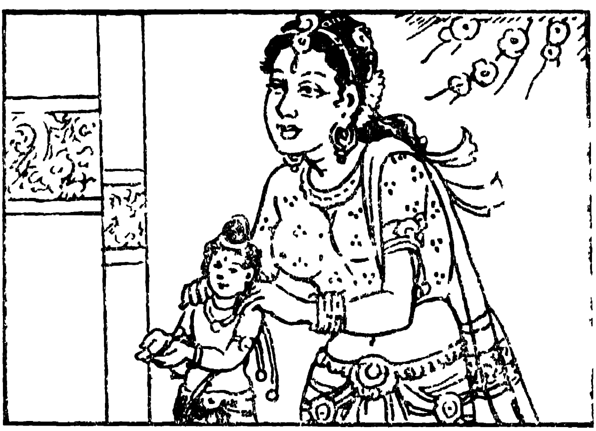
ভারতের দেব-দেউলের কথা

কালিদাসের কাহিনী শুনিয়াছ। সেই সময়টার অর্থাৎ গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে শুধু কাব্য নয়, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পও আমাদের দেশে খুব নাম করিয়াছিল। ঘরবাড়ী, মন্দিরাদির আকার, গঠন, কারুকার্য ইত্যাদিকে বলে স্থাপত্য-শিল্প। আর পুতুল ও মূর্তি নির্মাণের নাম ভাস্কর্য।

গুপ্ত যুগে তো বটেই, তাহার বেশ কিছুকাল পূর্ব হইতে অনেকদিন পর পর্যন্ত ভারতের দেব-দেউল বা মন্দির-নির্মাণ কার্যেব মধ্যে খুব বড় রকমের শিল্পজ্ঞান দেখা গিয়াছে। সমগ্র ভারতময় ইহার অনেক চিহ্ন ও নিদর্শন আছে। আমরা উহাব মাত্র কয়েকটার পরিচয় দিতেছি।

অজন্তা

অজন্তা হাযদবাবাদেব অন্তর্গত ঔরঙ্গাবাদ জেলার একটি গ্রাম ; আসলে পশ্চিমঘাট পবতমালাব একটি শাখা। জলগাঁও ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩৮ মাইল দূবে লোকালয়ের বাহিরে বনে



'মা ও ছেলে'—অজন্তা গুহার চিত্র

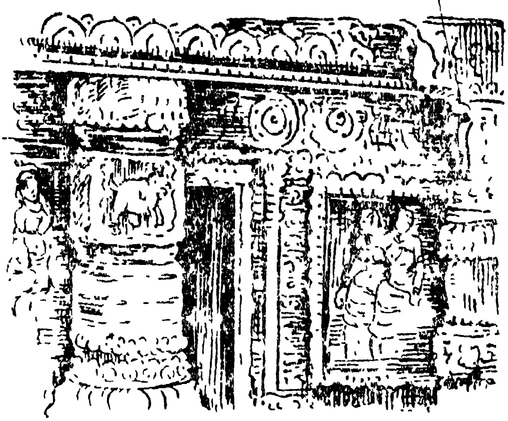
ঘেরা এক ফালি চাঁদের মত বিরাট এক পাহাড় অবস্থিত। অজন্তা কতকগুলি গুহামন্দির বিশেষ ; ইহা পাহাড় কাটিযা নির্মাণ করা হইয়াছিল। মন্দিরগুলির সামনে, পাহাড়ের নীচে

নদী বহিয়া যাইতেছে। মোট উনত্রিশটি গুহামন্দিরের মধ্যে চারটি হইল চৈত্য—অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের উপাসনা-গৃহ এবং পঁচিশটি বিহার—অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের বাসগৃহ। ইহাদের মধ্যে ষোলটি গুহামন্দিরের প্রাচীরের গায়ে ও ছাতের নীচে অতি সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা আছে। অযত্নে অনেকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু যতটুকু নিদর্শন আছে, তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। দেওয়ালে আঁকা ছবির জন্য অজন্তা বিখ্যাত। বুদ্ধদেবের জীবনের কাহিনীগুলির ছবি ইহাতে অঙ্কিত আছে। নানা প্রসিদ্ধ ঘটনা ও সামাজিক বিষয়ের কাহিনীগুলিও আঁকা আছে অজন্তা গুহায় মা ও ছেলে, রাজসভা, বীরপুরুষ, গাড়ীর উপরে সৈনিক, জাহাজ প্রভৃতি অনেক চিত্র আছে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে এই চিত্রগুলি দেখিবার জন্য বহু গুণী জ্ঞানী লোক এখানে আসিয়া থাকেন।

ইলোরা

ইলোরাও ঔরঙ্গাবাদেরই একটি গ্রাম। অজন্তা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইলোরার মন্দির পাহাড় কাটিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে। ইলোরার পাহাড় কাটিয়া যে সব মন্দির ও সন্ন্যাসীদের আশ্রম রচিত হয়, তাহাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাই প্রথমে আশ্রয় নেয়। বৌদ্ধদের পরে ব্রাহ্মণ শিল্পীরা বহু মন্দির নির্মাণ করেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন—এই তিন ধর্মের মন্দির ও চিহ্নই ইলোরার গুহামন্দিরে দেখা যায়। ভারতের গুহামন্দিরগুলির মধ্যে ইলোরার গুহামন্দিরগুলি আয়তনে

সকলের বড়। পাহাড়টি আধখানা চাঁদের মত। উহার উপরে দক্ষিণদিকে বৌদ্ধ মন্দির, উত্তর দিকে জৈন মন্দির, আর মধ্যখানে হিন্দু মন্দির। এইখানে দেখিবার মত অনেক মূর্তি



ইলোরার গুহামন্দিরের ভাস্কর্য

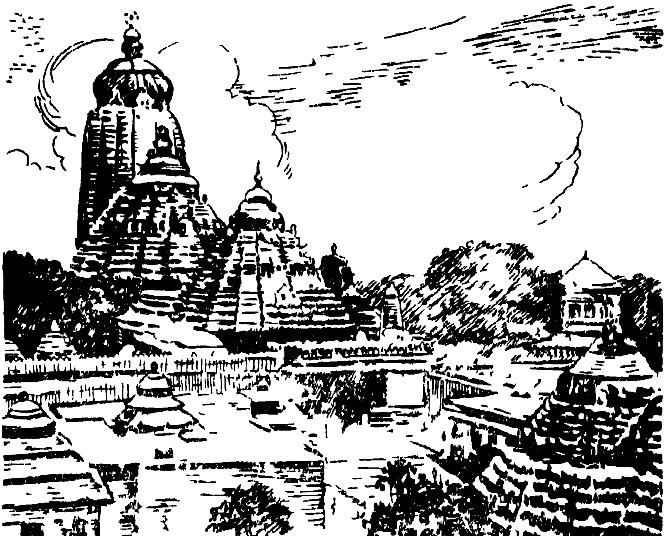
আছে। বৃহদাকার লোকেশ্বরের মূর্তি, ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি, কৈলাস, রাবণের আবাস, দশ অবতারের গুহা, ইন্দ্রসভা প্রভৃতি নিদর্শনগুলি সুন্দর শিল্প-নিদর্শন। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন এই মন্দির দেখিতে যায়।

পুরীর মন্দির

পুরী শহরে ও জিলায় অনেকগুলি প্রাচীর ও চমৎকার মন্দির আছে। উড়িষ্যা যে এক সময় ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহা এই সব মন্দির দেখিয়া আমরা জানিতে পারি। ইহা অজন্তা ও ইলোরার মন্দির নির্মাণের তিন শত বৎসর পর নির্মিত হইয়াছিল।

বাংলায় তখন সেন রাজাদের রাজত্ব। সেই সময় চোরগঙ্গা নামে এক রাজা কলিঙ্গ জয় করেন। জয়ের চিহ্ন স্বরূপ তিনি পুরীতে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। ইহার একশত পর এই জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মিত হয়।

সকলের আগে নজরে পড়িবে জগন্নাথদেবের বিরাট মন্দিরের দিকে। পর পর পশ্চিম দিক্ হইতে তিনটি মন্দির। একেবারে পশ্চিম ধারের মন্দিরের সূক্ষ্ম চূড়া অনেক উপরে উঠিয়াছে।



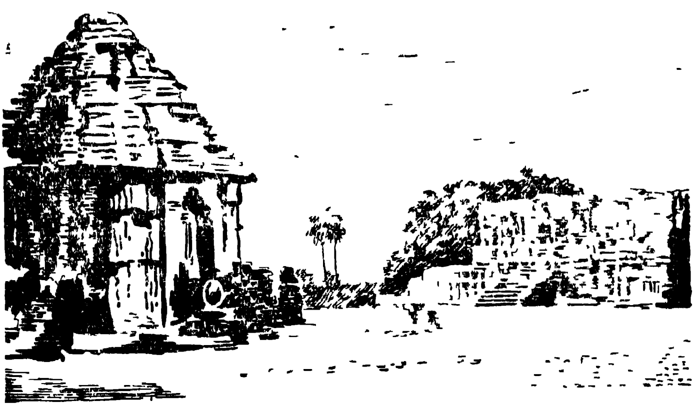
পুরীর মন্দিরের দৃশ্য

ইহাই আসল মন্দির বা দেউল। বড় দেউলের আগে যে তিনটি অংশ আছে তাহাদের নাম ভোগমণ্ডপ, জগমোহন, মুখশালা। পুরীর মন্দিরের কারুকার্য অতি সুন্দর।

পুরীর মন্দির নির্মাণ করিতে কয়েক শত বৎসর লাগিয়াছিল। মন্দিরের চারিদিকে চারটি বড় সিংহদ্বার। ইহার প্রধান সিংহদ্বার পূর্বদিকে। এই সিংহদ্বারের মুখেই বিরাট একটি স্তম্ভ আছে। পূর্বে এই স্তম্ভটি কোণারকে ছিল। যাহা হউক অনেকগুলি পাথরের সিঁড়ি পার হইয়া উপরে উঠিতে হয়। আসলে সমগ্র মন্দিরটি ছোট একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়টির নাম নীলাচল। পাহাড়ের চারিদিকেই প্রাচীর ঘেরা। এই প্রাচীরের মধ্যে জগন্নাথের মন্দির ছাড়া আরও অনেক প্রাচীন মন্দির ও মূর্তি আছে।

কোণারকের সূর্যমন্দির

এখন কোণারক একটা নির্জন পল্লী মাত্র। পুরী হইতে



কোণারকের সূর্যমন্দির

কুড়ি মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে দুর্গম পথ দিয়া যাইতে হয়। এক সময় এই মন্দিরের নিকটে পূর্বদিকে সমুদ্র ছিল। তখন এই

মন্দিরের মাথায় দাঁড়াইলে চমৎকার সূর্যোদয় দেখা যাইত। এখন প্রায় দুই মাইল দূরে সমুদ্র পিছাইয়া গিয়াছে। তবু অনেকে এখনও এই মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া সূর্যোদয় দেখে।

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে কোণারকের মন্দির নির্মিত হয়। কোণারকের মন্দিরটি সূর্যদেবের নামে উৎসর্গ করা। সূর্যমন্দিরটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রধান মন্দিরটির গায়ে নানা দেবদেবী, মূর্তি ও অন্যান্য চিত্র আঁকা। চিত্রগুলির গঠনভঙ্গী অনুপম। মন্দিরের উপরে একেবারে মূল চূড়ার নীচে শেষ চত্বরে চারিদিকেই চারিটি সূর্যমূর্তি আছে। সমগ্র মন্দিরটির আকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাকাযুক্ত রথের মত। রথের ঘোড়ার মূর্তিগুলিও বিরাট। অবশ্য সব ঘোড়া ও সব চাকা এখন আর নাই, অনেকগুলিই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু এই মন্দিরের গঠনকৌশল, কারুকার্য, মূর্তির কল্পনা পৃথিবীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের এক পরম বিস্ময়।

প্রশ্ন

১। অজন্তা কোথায় এবং অজন্তা সম্বন্ধে কি জান?

২। ইলোরা কোথায় এবং ইলোরার কাহিনী বল।

৩। পুরীর মন্দিরগুলির পরিচয় দাও।

৪। কোণারকের মন্দির কোন্ দেবতার মন্দির? মন্দিরের পরিচয় দাও।

হর্ষবর্ধনের কাহিনী

বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যে গভীর বন। সেইখানে একটা চিতা সাজান হইয়াছে। একটি বিধবা রাজকন্যা দূরে বসিয়া আছেন। সখীরা ও অন্যান্য লোকজন কাঁদিতেছেন। চিতায় আগুন জ্বালান হইল। রাজকন্যাও উঠিলেন। এমন সময়ে দূরে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।



কে আসে, শত্রু না তো? লোকজন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন সময় দূর হইতে ষোল বছরের এক রাজপুত্র ঘোড়ার উপর হইতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—"দিদি, চিতায় ঝাঁপ দিও না, কথা শোন!"

রাজকন্যা দাঁড়াইয়া পড়িলেন। পরিচিত স্বর!

একটু পরেই ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া রাজপুত্র “দিদি, দিদি” বলিয়া রাজকন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভাইবোনের চোখে জল। সকলেই কাঁদিতে লাগিল।

এই রাজপুত্র হইতেছেন শ্রীহর্ষবর্ধন, আর রাজকন্যা তাঁহার সহোদরা রাজ্যশ্রী।

হর্ষের বাবার নাম ছিল প্রভাকরবর্ধন। তাঁহার দুই পুত্র, এক কন্যা। বড় ছেলের নাম ছিল রাজ্যবর্ধন, ছোট ছেলের নাম হর্ষবর্ধন, আর কন্যার নাম রাজ্যশ্রী।

গুপ্ত সাম্রাজ্য তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রভাকরবর্ধন দিল্লীর নিকটবর্তী থানেশ্বরের রাজা ছিলেন। থানেশ্বরের আশে পাশে উত্তর ভারতে আর তিনটি বড় রাজশক্তি ছিল—কনৌজ, মালব ও গৌড়বঙ্গ। প্রত্যেকেই বড় হইবার চেষ্টা করিতেন, ফলে একের সঙ্গে অপরের আড়াআড়ি লাগিয়াই থাকিত। আবার, এক রাজা অন্য রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া তৃতীয় রাজাকে জব্দ করিতেন। ইতিমধ্যে প্রভাকরবর্ধন কনৌজের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিয়া ফেলিলেন; তিনি কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে নিজের একমাত্র কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিলেন। ফলে মালবের সঙ্গে প্রভাকরবর্ধনের বন্ধুত্ব নষ্ট হইয়া গেল।

মালবরাজ দেবগুপ্ত তাড়াতাড়ি গৌড়বঙ্গের রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলেন; তখন দুইজনে একত্র হইয়া প্রভাকর-বর্ধনকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

থানেশ্বর এই দুই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। থানেশ্বরের পশ্চিমে হুনরা মাঝে মাঝে উৎপাত করিত। এই সময়ে আবার

উৎপাত আরম্ভ হইল। প্রভাকরবর্ধন এবার হুনদিগকে তাড়াইতে বড় ছেলে রাজ্যবর্ধনকে পাঠাইলেন। রাজ্যবর্ধন ছিলেন খুব বীর পুরুষ। তিনি হুনদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আনন্দে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, কিন্তু মাঝপথে আসিয়া খবর পাইলেন মহারাজ প্রভাকববর্ধন মারা গিয়াছেন। রাজ্যবর্ধনের আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপুত্র রাজধানীতে ফিরিলেন। এবাব বাবার সিংহাসনে বসিলেন বাজ্যবর্ধন।

মালবরাজ দেবগুপ্ত এই সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি রাজা শশাঙ্কের সহায়তায় কনৌজ আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে কনৌজরাজ গ্রহবর্মণ মারা গেলেন। মালবরাজ রাণী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করিলেন।

এই দুঃসংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্ধন তীব্রবেগে ছুটিয়া গেলেন এবং মালবরাজ দেবগুপ্তকে হারাইয়া দিলেন। কিন্তু বাংলার রাজা শশাঙ্ক ছিলেন মহাতেজস্বী। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন নিজেই মারা গেলেন।

ছোটভাই হর্ষবর্ধন তখন মাত্র ষোল বছরের কিশোর। দাদা মারা গিয়াছেন, দিদি বন্দিনী—এই খবর পাইয়া হর্ষ গভীর শোক পাইলেন বটে, কিন্তু মোটেই ভয় পাইলেন না। বালক হইলেও তাঁহার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। তিনি শশাংককে আক্রমণের পূর্বেই দিদির অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং শেষে একেবারে চরম মুহূর্তে দিদিকে রক্ষা করিলেন। কাহিনীর প্রথমেই তোমরা তাহা পড়িয়াছ।

অতঃপর হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হইলেন। তাঁহার দিদির কোন সন্তানাদি ছিল না বলিয়া কনৌজের সিংহাসনেও তিনি বসিলেন। কনৌজ তখন দুই রাজ্যের রাজধানী হইল।

তারপর হর্ষ রাজ্য বিস্তার করিতে মনোযোগ দিলেন। উত্তর ভারতে নানা দেশ জয় করিয়া তিনি রাজ্যসীমা বাড়াইলেন। কিন্তু শশাংককে তিনি কিছুতেই হারাইতে পারিলেন না।

তারপর শশাংকের মৃত্যুর পর তিনি বাংলার কিছুটা অংশ দখলে আনিতে পারিলেন। দক্ষিণ-ভারতের পুলকেশী নামে এক জন রাজার সঙ্গেও তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবু একথা নিশ্চয় যে, উত্তর ভারতে তখন হর্ষবর্ধন সবশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। হর্ষবর্ধন কেবল বড় বীর যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি খুব বড় কবিও ছিলেন। তিনি বহু কবি ও পণ্ডিতকে নিজের সভায় রাখিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট ছিলেন তাঁহার সভাকবি। বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' নামে হর্ষবর্ধনের একখানা জীবনী লিখিয়াছেন। হর্ষবর্ধন অনেক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। **'রত্নাবলী'** নামে তাহার রচিত একখানা নাটক লোকে আজিও আনন্দের সঙ্গে পড়ে।

হর্ষবর্ধনের মত বড় দাতা তখনকার রাজাদের মধ্যে কেহ ছিলেন না। তাঁহারা শৈব ছিলেন, কিন্তু তাহার ভগিনী রাজ্যশ্রী ছিলেন বৌদ্ধ। ফলে শেষজীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রয়াগে (এলাহাবাদে) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে পাঁচ বৎসর পর পর এক বিরাট মেলা বসিত। দুই মাসেরও অধিক সময় এই মেলা স্থায়ী হইত। এই

মেলায় হর্ষবর্ধন সর্বস্ব বিলাইয়া দিতেন। শেষে নিজের পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত দান করিয়া একখানা সাদা কাপড় পরিয়া বুদ্ধমূর্তির পায়ের নীচে লুটাইয়া পড়িতেন। এইখানে সকল ধর্মের ও সকল জাতির লোকই তাঁহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিত।



হর্ষবর্ধন নিজ হাতে দান করিতেছেন

দেশের সংস্কৃতি ও লেখাপড়ার দিকে তাঁহার খুব দৃষ্টি ছিল। তাঁহার আমলেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিখ্যাত হয়। এইখানে দশ হাজার ছাত্র পড়াশুনা করিত এবং উহাদের সমস্ত খরচ রাজা বহন করিতেন। এই সময় বাঙ্গালী পণ্ডিত ভিক্ষু শীলভদ্র ছিলেন নালন্দার অধ্যক্ষ। আর চীন দেশের পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ্ নালন্দায় আসিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

এইভাবে প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৬৭৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মারা যান।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হয়। উহার কত বছর আগেকার কথা বলত?—এক হাজার তিনশত এক বৎসর আগের কথা।

প্রশ্ন

১। হর্ষবর্ধন কে ছিলেন? তাঁহার বাবার নাম কি? কোন কোন্ রাজার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন?

২। হর্ষবর্ধনের কি কি গুণ ছিল বল।

৩। রাজ্যশ্রী, রাজ্যবর্ধন, গ্রহবর্মণ, দেবগুপ্ত, শশাংক, শীলভদ্র পুলকেশী—ইঁহাদের কাহার সম্বন্ধে কি জান?

৪। হর্ষবর্ধনের সম্বন্ধে যাহা জান বল।

৫। হর্ষের দানের ও কবিত্বের উদাহরণ দাও।

৬। মালব, কনৌজ, নালন্দা প্রয়াগ—এই সব স্থানে হর্ষের রাজত্ব সম্বন্ধে কি জান?

ধর্মপালের কাহিনী

হর্ষবর্ধনের সময় বাংলার রাজা ছিলেন শশাংক। তোমরা তাঁহার কথা শুনিয়াছ। বহু চেষ্টা করিয়াও হর্ষবর্ধন শশাংককে পরাজিত করিতে পারেন নাই। শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলা-দেশের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতে থাকে। একশত বৎসবের মধ্যে দেশ একবারে অরাজক হইয়া যায়। তখন ছোট ছোট সামন্ত বাজা ও প্রজা মিলিয়া গোপাল নামে একজন শক্তিমান ব্যক্তিকে নিজেদের রাজা করিয়া লইয়াছিল।

এই গোপালের পর তাহার ছেলে ধর্মপাল বঙ্গদেশের রাজা হইলেন। ধর্মপাল খুব বড রাজা ছিলেন। সেই সময়েও হষবধনের সময়ের মত ভারতে তিনটি বড় রাজ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজন ছিলেন উত্তর ভারতে, আর একজন ছিলেন দক্ষিণ ভারতে। উত্তর ভাবতে ছিলেন ধর্মপাল আর বৎসবাজ এবং দক্ষিণ ভারতে ছিলেন মহারাজ ধ্রুব। ইহাদের মধ্যেও পরস্পর খুব যুদ্ধ হইত।

হষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতেছিল; তাহার উপর সিংহাসন লইয়া দুই ভাই চক্রায়ুধ ও চন্দ্রায়ুধ বিবাদ আরম্ভ করিলেন। ধর্মপাল এই সময়ে চক্রায়ুধকে সাহায্য করিলেন।

ওদিকে চন্দ্রায়ুধ গিয়া বৎসরাজের আশ্রয় নিলেন। প্রতিহার বংশীয় বৎসরাজও খুব শক্তিমান ছিলেন। কাজেই

ধর্মপালের সঙ্গে বৎসরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ধর্মপাল হারিয়া গেলেন।

কিন্তু এই যুদ্ধে ধর্মপালের খুব বড় একটা ক্ষতি হইল না। কারণ দক্ষিণ দিক্ হইতে রাষ্ট্রকূট বংশের ধ্রুব নামে এক বলশালী রাজা ঠিক সেই সময়েই বৎসরাজকে আক্রমণ করিলেন। এই তিন-মুখী যুদ্ধে কোন রাজাই যুদ্ধে হারিয়াও রাজাহারা হইলেন না।

ধর্মপালের সঙ্গেও ধ্রুবের যুদ্ধ হইল এবং ধর্মপাল জয়লাভ করিতে পারিলেন না ; কিন্তু তাহাতেও ধর্মপালের রাজ্য নষ্ট হইল না। পরে ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট বংশে বিবাহ করিয়া খানিকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

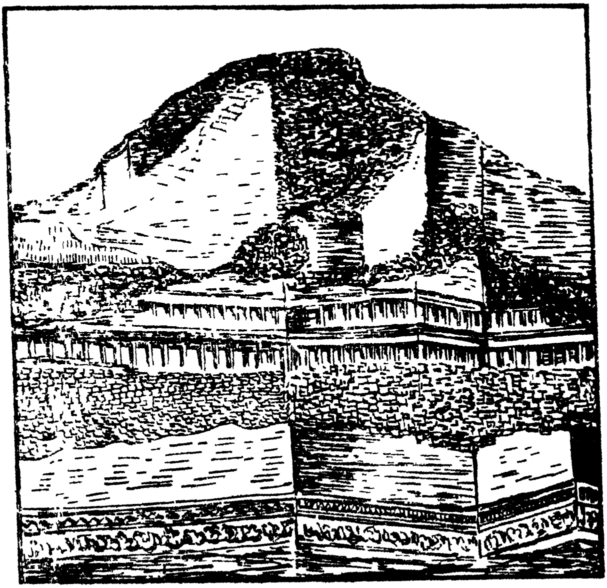


ধর্মপাল

এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও ধর্মপালের রাজ্যের সীমা খুব বেশী কমিল না। তিনি 'সম্রাট্' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অসাধারণ বীরত্বের জন্য তাঁহার এক নাম ছিল "বিক্রমশীল"।

ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি মগধে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য প্রকাণ্ড বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিহারের নাম "বিক্রমশীল বিহার"। বৌদ্ধ হইলেও হিন্দু বা অন্য কোন ধর্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহার মন্ত্রী ও সেনাপতিদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দু ছিলেন।

রাজসাহী জিলার পাহাড়পুরে একটি মহাবিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাও খুব সম্ভব ধর্মপালের কীর্তি। ধর্মপালের সময়ে বাংলা দেশের শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।



পাহাড়পুরের আবিষ্কৃত মহাবিহার

ধর্মপালের রাজধানী ছিল গৌড়ে। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন

১। ধর্মপালের পিতার নাম কি? কোথায় তাঁহার রাজধানী ছিল?

২। ধর্মপাল কোন্ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহার কি ফল হইয়াছিল?

৩। ধর্মপাল কোন্ ধর্মের লোক? তিনি কি কি কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন?

৪। ধর্মপাল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৫। 'বিক্রমশীল' কাহার উপাধি? এই নামে কোন্ বিহার পাওয়া যায়? কে এবং কোথায় উহা তৈয়ার করিয়াছিলেন?

বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের কাহিনী

ধর্মপালের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরের কথা। বাংলাদেশে আর একজন বড় রাজা জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বল্লাল সেন।

বল্লাল সেনের বাবা বিজয় সেন-ই সেন-রাজত্বকে বড় করিয়াছিলেন। বর্মন রাজাদের নিকট হইতে পূর্ববঙ্গ এবং পাল রাজাদের নিকট হইতে উত্তর বঙ্গ তিনি অধিকার করেন। মিথিলা, কালঙ্গ, কামরূপও তিনি আক্রমণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিজয়পুর এবং পূববঙ্গের বিক্রমপুর বিজয় সেনের রাজধানী ছিল। সেন রাজারা আসলে কিন্তু বাঙ্গালী ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যে বর্তমান হায়দ্রাবাদের খানিকটা আর মহীশূরের খানিকটা জায়গা লইয়া কর্ণাট নামে একটি রাজ্য ছিল। সেনরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন কর্ণাটের ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বংশের লোক ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে বাংলা দেশে আসিয়া গঙ্গার তীরে বাস করেন। এই সামন্ত সেন ছিলেন বিজয় সেনের পিতামহ। বিজয় সেনের পিতা হেমন্ত সেন-ই প্রথম জমিদারী আরম্ভ করেন এবং উহাই হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনের হাতে রাজ্যে পরিণত হয়।

সেনরাজ বংশের সর্বাপেক্ষা বড় রাজা ছিলেন বল্লাল সেন। তাঁহার পিতার সময়েও উত্তর বঙ্গের কতক অংশে পালরাজগণ রাজত্ব করিতেন। বল্লাল সেন তাহা কাড়িয়া লইলেন। বর্তমান

বাংলা দেশের সবটা এবং মগধের খানিকটা অংশ তাঁহার অধীনে ছিল। তখন তাঁহার রাজ্য বেশ বড় ছিল।

বল্লাল সেন রাজা হিসাবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। প্রজাদের সুখ-সুবিধার দিকে তাঁহার বিশেষ নজর ছিল। জলকষ্ট দূর করিবার জন্য তিনি বড় বড় দীঘি কাটাইয়া দিয়াছিলেন। এইগুলি এখনও বল্লাল-দীঘি নামে খ্যাত।



বল্লাল সেন

পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ, সেনরাজগণ ছিলেন হিন্দু। বল্লাল সেন হিন্দু সমাজকে উন্নত করিতে এবং যাহাতে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ, যজ্ঞ প্রভৃতি যথাযথ হয়, এইজন্য কান্যকুব্জ হইতে বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। লোকের মধ্যে উন্নত আদর্শের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়াইবার জন্য তিনি নবগুণ-যুক্ত এক কৌলিন্য প্রথা চালু করেন। বিদ্যা, বিনয় প্রভৃতি নয়টি গুণ যাঁহাদের থাকিত, তাঁহারা হইতেন কুলীন। পরে অবশ্য

কৌলিন্য প্রথা বংশগত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং বাংলা দেশের অনেক দুর্গতির কারণ হইয়াছিল। কিন্তু বল্লাল সেন ইহা ভাল বুঝিয়াই করিয়াছিলেন।

বল্লাল সেন নিজে খুব বড় পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। 'দান-সাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর' নামে দুইখানা বই তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বল্লাল সেনের রাজ্যত্যাগ ও মৃত্যু সম্বন্ধে একটি চমৎকার কাহিনী প্রচলিত আছে। বল্লাল সেন যখন কোন যুদ্ধে বা কঠিন রাজকার্যে যাইতেন, তখন সঙ্গে কতকগুলি পায়রা লইয়া যাইতেন। ইহা ঠিক ছিল যে, রাজার যদি মৃত্যু হয় বা জীবন সংশয় হয়, তবে পায়রাগুলি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবে।

একদিন বল্লাল সেন একটা যুদ্ধে গিয়াছেন। যুদ্ধে জয় হইয়াছে। ফিরিবার পথে হঠাৎ পায়রাগুলি খোপ হইতে বাহির হইয়া গেল। পায়রা দেখিয়া-ই রাণীরা রাজার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া আগুনে পুড়িয়া মারলেন।

অনেকদিন পর রাজা ফিরিয়া আসিলেন এবং সব ...শা পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে সিংহাসন দিয়া সংসার ত্যাগ... তিনি তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; অল্প কয়েক দিন পরই তাঁহা মৃত্যু হইল।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন যখন সিংহাসনে বসি... তখন তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। লক্ষ্মণ সেন যৌবনে বড় যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। গৌড়ের রাজা, কামরূপরা... কালঙ্গরাজ, কাশীরাজ সকলেই তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত

হইয়াছিলেন। পুরী, এলাহাবাদ ও কাশীতে তাহার বিজয়স্তম্ভ ছিল। লক্ষ্মণ সেন শুধু বীর যোদ্ধাই ছিলেন না, পিতার মত পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। বল্লাল সেন 'অদ্ভুত সাগর' গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। লক্ষ্মণ সেন ইহা সম্পূর্ণ করেন। ইহাছাড়া তাঁহার রচিত অনেক শ্লোক পাওয়া যায়। তিনি পণ্ডিত ও কবিদিগকে রাজসভায় যত্ন করিয়া রাখিতেন। ধোয়ী, শারণ, উমাপতি, গোবর্ধন প্রভৃতি কবি ও পণ্ডিতেরা তাঁহার সভায় ছিলেন। সকলের সেরা ছিলেন কবি জয়দেব।



লক্ষ্মণ সেন

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থখানা সংস্কৃত সাহিত্যের একখানা খ্যাত কাব্য। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা রা হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেন নিজে বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৈষ্ণব-র্ম প্রচারেরও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলায়ুধ।

লক্ষ্মণ সেনের শাসনের শেষের দিকে রাজ্যে কিছু কিছু

অশান্তি দেখা দিয়াছিল। রাজা তখন অতিবৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ধর্মকর্মের দিকেই তাঁহার মন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল কাজেই এই সুযোগে রাজকর্মচারীরাও অসাধু হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন নামে মহম্মদ ঘোরীর এক অনুচর আকস্মিক ভাবে নদীয়া আক্রমণ করেন। যুদ্ধ-বিমুখ, অসৎ কর্মচারীরা পূর্ব হইতেই রাজাকে বুঝাইতেছিলেন যে, শাস্ত্রে লেখা আছে 'এই দেশ যবনের শাসনভুক্ত হইবে। কাজেই মুসলমানদিগকে বাধা দিয়া লাভ নাই।' তবুও লক্ষ্মণ সেন শেষদিন পর্যন্ত নদীয়াতেই থাকিলেন। নদীয়া আক্রান্ত হইবার পর তিনি নৌকায় চড়িয়া পূর্ববঙ্গের রাজধানীতে গমন করেন। লক্ষ্মণ সেন ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন না। কেবল বৃদ্ধ ও নিরুপায় বলিয়া পলাইয়া যান। ইহার পর তিন-চার বৎসর পর্যন্ত তিনি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রায় ছিয়াশি বৎসর বয়সে লক্ষ্মণ সেন দেহত্যাগ করেন।

লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বাংলার শেষ হিন্দুরাজা। তাঁহার পরই বাংলায় মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হয়।

প্রশ্ন

১। বল্লাল সেন কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? সেনদের পূর্বপুরুষ কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন?

২। বল্লালসেনের সম্বন্ধে যাহা জান বল।

৩। কুলীন কাহাকে বলে? কে কৌলিন্য-প্রথা চালু করেন?

৪। বল্লাল সেনের মৃত্যু সম্বন্ধে কি প্রবাদ আছে?

৫। বল্লাল সেনের পাণ্ডিত্যের ও রাজ্যশাসনের বিষয় কি জান বল।

৬। লক্ষ্মণ সেন কত বৎসর বয়সে রাজা হইয়া কত বছর পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন?

৭। লক্ষ্মণ সেন কোন্ ধর্মের লোক ছিলেন? তাঁহার সাহিত্য-প্রীতি ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কি জান?

৮। লক্ষ্মণ সেন কি বীর ছিলেন? কাহার আক্রমণে তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করেন?

৯। জয়দেব, হলায়ুধ, ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন—ইঁহাদের সম্বন্ধে কি জান?

হুসেন শাহের কাহিনী

লক্ষণ সেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় হিন্দু-রাজত্বের অবসান হইল। তারপর মুসলমান রাজগণ বাংলাদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যেও মতের মিল ছিল না' মুসলমান রাজাদের বলা হইত সুলতান।

লক্ষ্মণ সেনের পর প্রায় তিন শত বৎসর পরের কথা। ইতিমধ্যে বাংলায় অনেক সুলতান বদল হইয়াছে। তখন বাংলার মুসলমানদের মধ্যে 'হাবসী' নামে এক জাতীয় মুসলমানের প্রাধান্য বড় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আবিসিনিয়া নামে আফ্রিকায় একটা দেশ আছে, সেখানকার লোকদের বলা হয় হাবসী। হাবসীরা ভয়ানক অত্যাচারী ছিল। উহারা সামান্য কারণে মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। হিন্দু-মুসলমান কেহই এই শ্রেণীর লোকদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না, অথচ ভয়ে কেহ কিছু বলিতে সাহস পাইত না।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বাংলার সিংহাসনে ছিলেন এক হাবসী সুলতান—নাম মজঃফর শাহ্। হুসেন নামে মজঃফর শাহের একজন উজীর ছিলেন। হুসেন অল্প বয়সে আরব দেশ হইতে হিন্দুস্থানে আসেন। হজরত মুহম্মদের কন্যার বংশের সঙ্গে তাঁহার বংশের আত্মীয়তা ছিল বলিয়া মুসলমানগণ হুসেনকে খুব মান্য করিত। আর হিন্দুরাও তাঁহার মধুর ব্যবহার ওশান্ত প্রকৃতির জন্য তাঁহাকে ভালবাসিত। সকলের সহায়তায়

এই হুসেন-ই মজঃফর শাহ্‌কে গদিচ্যুত করিয়া বাংলাব সুলতান হইলেন।

এই ঘটনায় বাঙালী সাধারণ হিন্দু-মুসলমান খুব খুশি হইল। অতঃপর হুসেন শাহ্‌ সকল হাবসীকে বাংলার বাহিবে তাড়াইয়া দিলেন। কাজেই হুসেন শাহের বাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর তিনি ক্রমে ক্রমে বাজ্যের সীমানাও বাড়াইয়া দিলেন। সমগ্র কামরূপ, রংপুর এবং ত্রিপুবার কিছু অংশও তিনি নিজ বাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।



হুসেন শা্‌

মুসলমানী রাজত্বে হিন্দুদিগেব কোন সুবিধা ছিল না। হুসেন শাহ্‌ কিন্তু হিন্দুদিগকে উপযুক্ত দেখিয়া বড় বড় পদ দিতে লাগিলেন। পুরন্দর খাঁ হইলেন হুসেনের একজন উজীর। রূপ, সনাতন, অনুপম প্রভৃতি হিন্দুগণ বড় বড় রাজপদে কাজ করিতে লাগিলেন। হুসেন শাহ্‌ হিন্দুদিগকে ধর্মাচরণ বিষয়েও অনেক-

খানি সুবিধা দিলেন। তাঁহার সময়েই নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়।

হুসেন শাহ্ আর একটি মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন, যাহার তুলনা নাই। কোন দেশের সাহিত্যই রাজার সাহায্য না পাইলে উহা পুষ্ট ও বড় হইতে পারে না। বাংলা সাহিত্যকে হুসেন শাহ্ যে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে কোন রাজা তেমনটা



সোনা মজিদ

করেন নাই। তিনি বড় বড় পণ্ডিতের দ্বারা রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির অনুবাদ করাইয়াছেন; আবার কবিদিগকে অর্থ ও খেতাব দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার-ই শাসনকালে

বর্ধমানের মালাধর বসু **'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'** রচনা করেন। চট্টগ্রামের শ্রীকর নন্দীর **মহাভারত** ও বরিশালের বিজয় গুপ্তের **মনসামঙ্গল**—হুসেন শাহের রাজত্ব কালেই রচিত হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে হুসেনী সাহিত্যের দান অমর হইয়া আছে।

হুসেন শাহ্ অনেক বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন ও দীঘি কাটাইয়াছিলেন। এখন উহাদের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে গৌড়ের সোনা মসজিদ তাহার তৈরী অন্যান্য মসজিদের মধ্যে একটি।

প্রায় ছত্রিশ বছর রাজত্ব করিবার পর হুসেন শাহ্ দেহত্যাগ করেন।

প্রশ্ন

১। হুসেন শাহ্ কোন দেশী লোক ছিলেন? কেমন করিয়া তিনি সুলতান হইলেন?

২। সুলতান হইয়া তিনি কি কি জনহিতকর কাজ করিয়াছিলেন?

৩। বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি কি করিয়াছেন?

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় কি বল'—মুজাফর শাহ্, পুরন্দর খাঁ। রূপ ও সনাতন, শ্রীকর নন্দী মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত।

শ্রীচৈতন্যদেবের কাহিনী

চারশত বাষট্টি বৎসর আগের কথা।

সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি। ফাল্গুনী পূর্ণিমা। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে লোকে লোকারণ্য; চন্দ্রগ্রহণ হইবে। একে দোল-পূর্ণিমা, তায় আবার গ্রহণ—অসংখ্য লোক দলে দলে হরিনাম কীর্তন করিতেছে, হরিধ্বনি দিতেছে। এমন সময় নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণের কুটীরে শচীদেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। কাঁচা সোনার মত রং, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল, পদ্ম কলির মত চোখ—হৃষ্টপুষ্ট শিশু।

নিমতলায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া মা তার নাম রাখিলেন নিমাই। ধবধবে ফরসা রংএর জন্য লোকে ডাকিত গৌরাঙ্গ বা গোরাচাঁদ। আর পিতা জগন্নাথ মিশ্র 'অন্নপ্রাশন' উৎসব সম্পন্ন করিয়া তাহার নাম রাখিলেন বিশ্বম্ভর।

জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টের লোক। নবদ্বীপে টোল খুলিয়া বসবাস করেন। তাঁহার বড় পুত্র বিশ্বরূপ পড়াশুনায় খুব ভাল ছাত্র ছিলেন; কিন্তু একদিন হঠাৎ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

কাজেই বাবা-মা কেহই নিমাইকে আর লেখাপড়ার মধ্যে দিতে চাহিলেন না। নিমাই ছিলেন যেমন দুর্দান্ত, তেমনি বুদ্ধিমান। তিনি নবদ্বীপের পল্লীতে পল্লীতে, গঙ্গার ঘাটে নানা

উৎপাত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নালিশ শুনিয়া শুনিয়া শচীদেবী যখন নিমাইকে গালাগালি দিতে গেলেন, তখন নিমাই বলিলেন, "আমি তো মূর্খ, তোমরা আমাকে লেখাপড়া শিখালে না, বুদ্ধি হবে কি করে?"



শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

তখন সকলের পরামর্শে মিশ্র মহাশয় ও শচীদেবী নিমাইকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করিয়া দিলেন। অল্প কয়েক

বৎসরের মধ্যেই নিমাই পাঠ শেষ করিয়া পণ্ডিত হইয়া বসিলেন।

জগন্নাথ মিশ্র মারা গিয়াছেন। আঠার উনিশ বৎসরের নিমাই টোল খুলিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইহার মধ্যে কেশব কাশ্মিরী নামে কাশ্মীর দেশীয় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে তর্কযুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু নবদ্বীপের বৃদ্ধ ও বড় বড় পণ্ডিতগণ কেহই সাহস করিয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না। শেষে বালক নিমাই পণ্ডিত কাশ্মিরীকে একদা তর্কযুদ্ধে হারাইয়া দিলেন।

গয়াতে পিতার পিণ্ড দান করিতে গিয়া নিমাইর কি এক ভাবান্তর হইল। তিনি একবারে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া উঠিলেন। তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার ভাবান্তর মা শচীদেবী ও স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিমাই নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি নবদ্বীপের বৈষ্ণবদিগকে লইয়া রাতদিন হরিনাম কীর্তন করিতে সুরু করিলেন।

সে সময় বাংলার শাসক ছিলেন সুলতান হুসেন শাহ্। সুলতান নিজে নিমাইকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। মুসলমানগণও নিমাইকে ভক্তি করিত। তাঁহার একজন প্রধান শিষ্যের নাম ছিল যবন হরিদাস বা হরিদাস ঠাকুর।

চব্বিশ বৎসর বয়সে নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া মা ও স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিয়া যান। তখন তাঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যদেব। সন্ন্যাসী হইয়া তিনি বৃন্দাবন, মথুরা,

কাশী প্রভৃতি উত্তর ভারতের সমস্ত তীর্থস্থান ও রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলিতে পরিভ্রমণ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব মাত্র ৪৮ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। জীবনের শেষের দিকে প্রায় বার বছর তিনি পুরীধামেই কাটাইয়া দেন। প্রতি বৎসর রথের সময়ে বাংলা দেশ হইতে হাজার হাজার লোক তাঁহাকে দেখিতে যাইত।

শ্রীচৈতন্যদেব শুধু যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহাই নহে, তখনকার দিনে সমাজের মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। তখনকার দিনে হিন্দুদিগের মধ্যে জাতিভেদ কুপ্রথার ফলে বহু নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান হইয়া যাইতেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, কেবল হরিনামেই মুক্তিলাভ হইতে পারে। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সকলেই একসঙ্গে হরিনাম কীর্তন করিতে পারে। তাঁহার এই প্রেমের বাণী ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বাংলার সমস্ত পতিত ও নীচ জাতি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিলেন।

সেই সময়ে ভারতবর্ষে শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন মহান ও প্রেমিক মহাপুরুষদিগের অন্যতম। জীবিত অবস্থায়ই তিনি ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা পাইয়াছেন। কথিত আছে, পুরীধামে জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যান। অনেক ভক্ত তাঁহার সঙ্গে মিলিত হয়। শোনা যায় হরিনাম করিতে করিতে তিনি প্রায়ই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। তারপর একদিন পূর্ণিমারাতে সমুদ্রের নীল জলকে শ্রীকৃষ্ণ

ভাবিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর।

প্রশ্ন

১। শ্রীচৈতন্যদেবের কি কি নাম হইয়াছিল? কবে, কখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন?

২। নিমাই পণ্ডিতের বাল্যজীবন ও অধ্যাপক জীবন সম্বন্ধে যাহা জান বল।

৩। সন্ন্যাসী হইবার পর তিনি কি কি করিয়াছেন?

৪। কোথায় কি ভাবে তাহার মৃত্যু হয়?

৫। তাহার ধর্মমত কি এবং ইহাতে হিন্দুদের কি উপকার হইয়াছে?

৬। নিম্নলিখিত লোকদিগের পরিচয় দাও:—

বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীদেবী, নিতাই, যবন হরিদাস, কেশব কাশ্মিরী, অদ্বৈত আচার্য, গঙ্গাদাস।

শিবাজীরকাহিনী

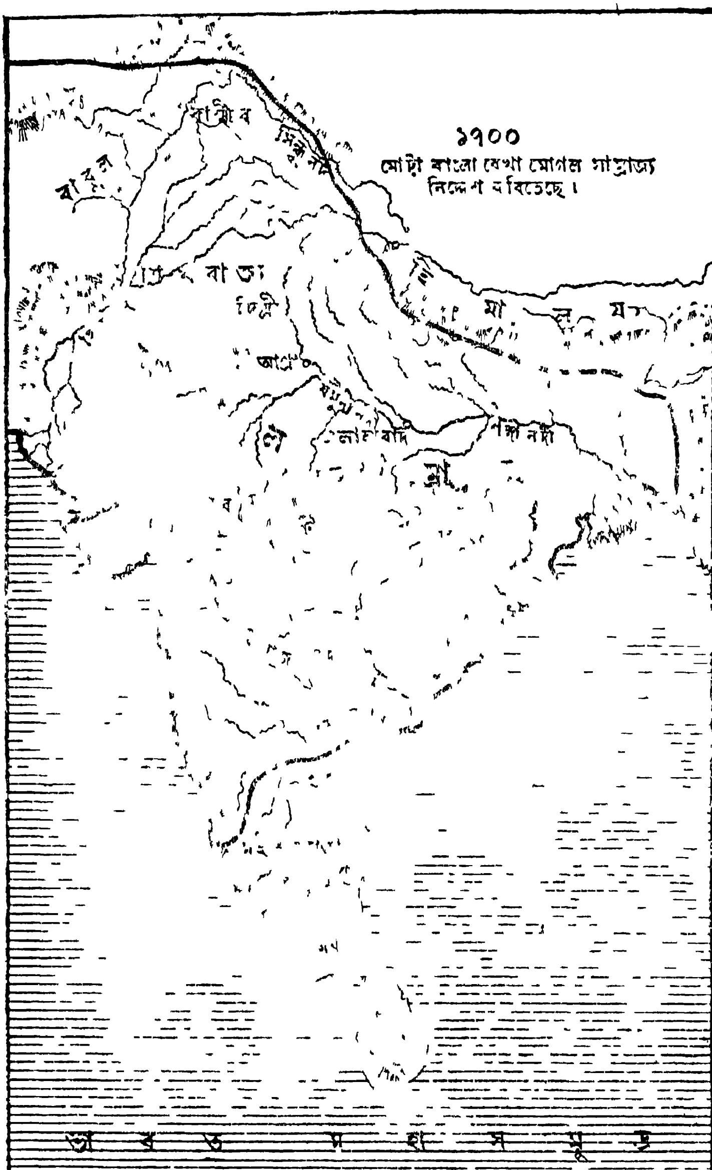
অন্ধকার রাত্রি। মোগল সেনাপতি দক্ষিণ ভারতের সুবেদার নবাব শায়েস্তা খানের শিবিরের চারিদিকে আনন্দ উল্লাস। হাজার হাজার ফৌজ চতুর্দিকে ছড়ান। যুদ্ধে জয় নিশ্চিত; শত্রু কেবলই হটিয়া যাইতেছে। যুদ্ধ না করিয়া পলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু ধরা পড়িবেই, পালাইবে কোথায়?

হঠাৎ অন্ধকারে ঘোড়ার পায়ের শব্দ আসিল খট্ খট্ খট্। কেহ গ্রাহ্য করিল না। দুশমন্ তো আব আসিবে না!

ক্রমে শব্দ কাছে আসিয়া পড়িল। তারপর নিশ্চিন্ত দেহরক্ষীদিগকে তীব্র বেগে নিরস্ত করিয়া ঘোড়সওয়ারগণ সুবেদার শায়েস্তা খানের শিবিরে ঢুকিয়া পড়িল। সুবেদারের এক পুত্র নিহত ও দুই পুত্র আহত হইলেন। সুবেদার নিজেও আহত হইয়া অন্ধকারে ছুটিয়া পলাইলেন।

একটা ভূমিকম্পের মত ভয়ানক ক্ষিপ্রতা লইয়া ঘোড়সওয়ারগণ মারিয়া, কাটিয়া, লুটপাট করিয়া বিদ্যুৎবেগে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

সকলে বলিল—সাবাস! বাহাদুর বটে!! কে ইহারা জান? ইহারা মারাঠা ফৌজ, আর এই দলের সর্দার স্বয়ং শিবাজী। আর যাহাকে কাবু করিলেন, তিনি ঔরঙ্গজেবের মাতুল শায়েস্তা খান,—দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবেদার বা শাসনকর্তা।


১৭০০
মোটা কালো রেখা মোগল সাম্রাজ্য
নির্দ্দেশ করিতেছে।
কাশ্মীর
সিন্ধু নদী
দিল্লী
আগ্রা
এলাহাবাদ
গঙ্গা নদী
ভারত মহাসমুদ্র

কে এই শিবাজী জান? শোন বলি। কিন্তু তাহার আগে একবার ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া দেখ। বিন্ধ্য-পর্বতশ্রেণী পূর্ব-পশ্চিমে বাড়িয়া ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছে। বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে গিয়াছে পশ্চিমঘাট পর্বত—একেবারে সমুদ্রের পাশ দিয়া। এই পার্বত্য অঞ্চল হইতেছে মহারাষ্ট্র দেশ। এখন ইহার কিছুটা বোম্বাই



অশ্বপৃষ্ঠে শিবাজী

এবং কিছুটা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। মারাঠারা পার্বত্য জাতি বলিলেও বেশী বলা হয় না। সাহসী, বীর, কর্মঠ, ধর্মপ্রাণ—ভারতের খুব একটা বড় জাতি মারাঠা।

এই মারাঠা শক্তিকে যে মহাপুরুষ সংঘবদ্ধ করিয়াছেন,

তাঁহার নাম শিবাজী। বিরাট জীবন শিবাজীর। তাঁহার জীবনে ঘটনার সংখ্যা অনেক। তোমরা বড় হইয়া পাঠ করিও।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের ৯৪ বৎসব পর শিবাজী জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শাহজী বিজাপুর সুলতানের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। শাহজীর দুই স্ত্রী। শিবাজীর মাতা জীজাবাঈ বাড়ীতে থাকতেন। আর বিমাতা তুকাবাঈ শাহজীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন।

জীজাবাঈ অতি ধর্মপ্রাণা ও তেজস্বী মহিলা ছিলেন। শিবাজীর জীবনে মায়ের প্রভাব খুব বেশী। মাতা ও দাদাজী কোণ্ডদেব নামে একজন বৃদ্ধের তত্ত্বাবধানে শিবাজী পুনরায় থাকিতেন। পরবর্তী জীবনে তাহার গুরু রামদাস স্বামীর প্রভাবও তাঁহার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই শিবাজী যুদ্ধবিদ্যায় খুব নিপুণ হইয়া উঠেন। কিন্তু তিনি লেখাপড়াতে মোটেই উৎসাহ পাইতেন না। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি লোকজন সংগ্রহ করিয়া বিজাপুরের সুলতানের নিকট হইতে তোর্ণা দুর্গ দখল করিলেন এবং ক্রমে শিবাজী পুরন্দরে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন।

তারপর ঔরঙ্গজেব যখন 'আলমগীর' উপাধি ধারণ করিয়া আগ্রার সিংহাসনে বসেন, তখন শিবাজীও দক্ষিণে যথেষ্ট শক্তিমান হইয়াছেন। ঔরঙ্গজেব অবিলম্বে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার

মাতুল শায়েস্তা খানকে শিবাজীকে দমনের জন্য পাঠাইলেন। তাহার ফলাফল কি হইল, তাহা আগেই বলিয়াছি।

এই যুদ্ধের খবর পাইয়া ঔরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি রাজা জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে অসংখ্য ফৌজ দিয়া শিবাজীকে জব্দ করিতে পাঠাইলেন। জয়সিংহ ছিলেন খুব চতুর। তিনি বীজাপুররাজের সঙ্গে সন্ধি করিয়া শিবাজীর রাজ্য ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং একে একে দুর্গ দখল করিতে লাগিলেন। পুরন্দর দুর্গে শিবাজী ও অন্যান্য সেনাপতিদের পরিবারবর্গ থাকিত, কাজেই পুরন্দর বিপন্ন হইলে শিবাজী মোগলকে কর দিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তারপর জয়সিংহ শিবাজীকে কোনরূপ অসম্মান করা হইবে না এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি তাঁহাকে আগ্রা পাঠাইয়া দিলেন। শিবাজী কিন্তু ঔরঙ্গজেবের দরবারে গিয়া প্রতিশ্রুতিমত ব্যবস্থা না দেখিয়া প্রকাশ্য দরবারেই ইহার প্রতিবাদ করিলেন। ফলে আগ্রা দুর্গে শিবাজীকে বন্দী করা হইল। ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে হত্যা করিবার ফিকির খুঁজিতে লাগিলেন।

শিবাজী যেমন সাহসী, তেমনি বুদ্ধিমান ছিলেন; কাজেই তিনিও পলায়নের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন তিনি জানাইলেন যে, তাঁহার অসুখ করিয়াছে এবং ইহার জন্য পূজা ও যজ্ঞ করিয়া ফল ও মিঠাই ব্রাহ্মণ ও সাধুদিগকে দান করিতে হইবে। বাদশাহ এই আবেদন মঞ্জুর করিলেন।

পূজা হইয়া গেল। শত শত ঢাকা দেওয়া ফলের ও

মিঠাইয়ের ঝুড়ি ভৃত্যেরা আগ্রা দুর্গের বাহিরে দান করিতে লইয়া গেল। ইহারই একটি ঝুড়িতে লুকাইয়া শিবাজী শত্রু দুর্গের বাহিবে চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকালে দেখা গেল শিবাজী বিছানায় শুইয়া আছেন। বেলা হইল, ভয় পাইয়া প্রহরী কারাধ্যক্ষকে খবব দিল। কাফের মরিয়া যায় নাই ত! তারপর সকলে গিয়া বিছানার চাদব তুলিয়া দেখিল, বালিস ঢাকা রহিয়াছে—খাঁচা শূন্য, পাখী নাই।



ঝুড়ির ভিতর লুক্কাইত অবস্থায় শিবাজী

খবর পাইয়া ঔরঙ্গজেব আগুন হইয়া গেলেন। শিবাজীকে ধরিতে চতুর্দিকে লোক ছুটিল। কিন্তু যে সিংহ খাঁচা ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, তাঁহাকে কে আর পাশবদ্ধ করে! অনেক আঁকাবাঁকা পথ ঘুরিয়া শেষে শিবাজী মহারাষ্ট্রে পৌঁছিলেন।

তারপর আর ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে আয়ত্তে আনিতে পারেন নাই। ক্রমে দাক্ষিণাত্যে নিজের অধিকার বিস্তৃত ও দৃঢ় করিয়া শিবাজী 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু কাজের তুলনায় তিনি অল্পায়ু ছিলেন। মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন

১। শিবাজী কে ছিলেন? তাঁহার জন্মস্থান ও পিতামাতার নাম কর।

২। শায়েস্তা খান কে? কেমন করিয়া শিবাজী শায়েস্তা খানকে আহত করেন?

৩। আগ্রার কারাগার হইতে শিবাজী কিভাবে পলায়ন করেন? শিবাজীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। দাদাজী কোণ্ডদেব, জয়সিংহ, ঔরঙ্গজেব—ইহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

জবচার্ণক ও কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা

ঔরঙ্গজেব তখন দিল্লীর বাদশাহ। বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর বন্দরগুলিতে ইউরোপীয় বণিকদের অনেক কুঠি ছিল। কাশিমবাজার ও পাটনায় ইংরেজদের কুঠি ছিল। এই সকল কুঠিতে বসিয়া ইংরেজেরা ব্যবসা চালাইত। ইংরেজদের ব্যবসায়ের কোম্পানীর নাম ছিল **'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'**।

জবচার্ণক হুগলীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেম্পানীর প্রধান এজেন্ট। চার্ণক প্রায় ৩৫ বৎসর আগে বিলাত হইতে মাত্র মাসিক ২০ পাউণ্ড বেতনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী নিয়া এই দেশে আসিয়াছিলেন। প্রথমে বালেশ্বর ও রাজমহলের কুঠিতে, পরে পাটনা কুঠিতে কাজ করিতেন। তাহার কাজ ছিল সোরা খরিদ করিয়া মাদ্রাজে পাঠান। এই সোরা মাদ্রাজ হইতে বিলাতে রপ্তানি করা হইত।

চার্ণকের বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তিনি যখন পাটনাতে কাজ করিতেন, তখন একদিন স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতে উদ্যত একটি পনর বৎসর বয়স্ক হিন্দু মেয়েকে প্রহরিগণের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া আনেন। পরে এই মেয়েটিকে তিনি বিবাহ করেন। ইহাদের তিনটি মেয়ে হইয়াছিল। তিনি মেয়েদের উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কলিকাতা সেণ্ট জন গির্জা সংলগ্ন

সমাধিক্ষেত্রে চার্ণক ও তাহাব এই স্ত্রীব সমাধি এখনও আছে। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দেব ১০ই জানুযাবী তাবিখে জবচার্ণকেব মৃত্যু হয। চার্ণক তখনকাব ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীব গভর্ণবেব মন্ত্রণাসভার সভ্য ছিলেন। ক্রমে ক্রমে চার্ণকেব ক্ষমতা বাড়িযা গেল। তিনি ঐ গভর্ণবকে পদচ্যুত কবিলেন এবং কিছুকাল পবে তিনি নিজে ঐ পদ লাভ কবেন।



জব চার্ণকের স্বাক্ষর

মোগল সৈন্যদের হাত হইতে আত্মবক্ষার জন্য জবচার্ণক সূতানুটি গ্রামে পলাইয়া আসেন। জবচার্ণক যেদিন সূতানুটির ঘাটে জাহাজ বাঁধিলেন, সেদিনই কলিকাতাব প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। ইহা ভারতেব স্বাধীনতার তাবিখ হইতে দুইশত সাতান্ন বৎসর আগেকার কথা (১৬৯০ খৃষ্টাব্দেব ২৪শে আগষ্ট)।

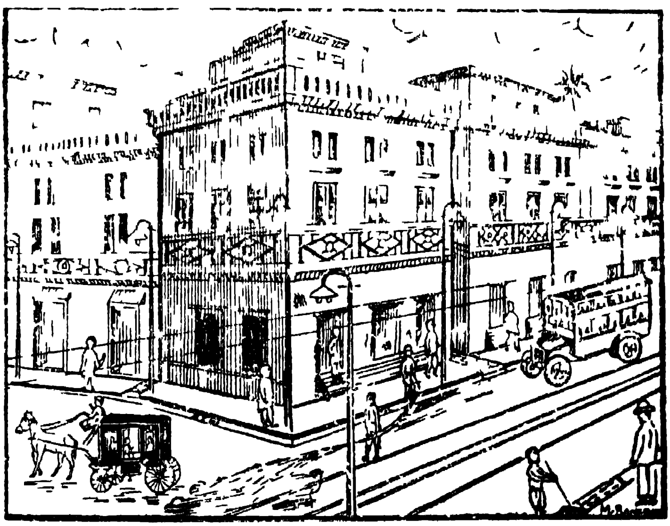
চার্ণক ঔরঙ্গজীবের নিকট হইতে নূতন সনদ (১৬৮০ খৃঃ) লাভ করিলেন। তিনি যখন সূতান্থটিতে আসেন, তখন তাদের মাথা রাখিবার জায়গা ছিল না। চার্ণকদের তখন বোটের উপর থাকিতে হইত। পরে ইংরেজগণ জমিদারদের কাছ হইতে সূতান্থটি কিনিয়া লইলেন।

তখন বর্তমান কলিকাতার প্রায় সবটাই ছিল ঘোর জঙ্গলে ঢাকা। এখনকার চৌরঙ্গী ও রাজভবন অঞ্চলে বাঘের বাসা ছিল। দিনের বেলায়ও সে অঞ্চলে লোক যাতায়াত করিত না। চাঁদপাল ঘাটের কাছে বেচা-কেনাব জন্য তাঁতিদের কয়েকটি কুড়েঘব মাত্র ছিল।

সূতান্থটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনটি গ্রাম লইয়া কলিকাতা নগরীর পত্তন হয়। বর্তমান বাগবাজাবের খাল হইতে বড়বাজারের টাকশাল পর্যন্ত স্থানের নাম সূতান্থটি, তারপর কাসটম্ হাউজ পর্যন্ত কলিকাতা, তারপর একেবারে ময়দানের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত ছিল গোবিন্দপুরের সীমানা। এখনকার বেহালার চৌধুরীদের পূর্বপুরুষরা কলিকাতার জমিদার ছিলেন। ইংরেজগণ মাত্র তের শত টাকায় জমিদারী কিনিলেন। যে দলিলে (১৬৯৮ খৃঃ) কলিকাতা কেনা হয়, তাহা এখনও বিলাতের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

প্রাচীন কলিকাতার চেহারা এখন আর অনুমান করাও চলে না। সেই সব ইমাবত ও গীর্জা এখন আর নাই, সরকারি অফিসগুলিও নষ্ট হইয়াছে, তবে পল্লীর নামের মধ্যে কিছু কিছু

ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। দর্মাহাটা, হাটখোলা, সোনাপটি, গরাণহাটা, আহিড়িটোলা, মুচিপাড়া ইত্যাদি নামেব মধ্যে স্থান-, গুলিতে কি কাজ হইত ও কাহারা বসবাস কবিত, তাহার আভাস পাওয়া যায়।



কলিকাতা মহানগরী

এই সময়ে বর্ধমান অঞ্চলে শোভা সিংহ নামে একজন জমিদার ছিল। সে তথায় বিদ্রোহ করিয়াছিল। তাহাকে দমন করিবার জন্য নবাব আসিলেন। ইংরেজেরা তাহাদের

সাহায্য করিল; সেজন্য নবাব ইংরেজদেব কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ করিতে অনুমতি দিলেন। এই দুর্গ নির্মাণের পব হইতেই কলিকাতার উন্নতি হইতে লাগিল। ইংবেজের দুর্গ থাকায় স্থানীয় অধিবাসীরাও নিজেদেব নিবাপদ মনে কবিল। সেজন্য তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে লাগিল এবং অধিক সংখ্যায় বসবাস করিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম সূতানুটির নামই ইংরেজেবা ব্যবহার কবিত। তাহার পর (১৭০০ খৃঃ) 'কলিকাতা' নাম ব্যবহৃত হইতে থাকিল। জবচার্ণক কলিকাতায় থাকিতেন না। তিনি বারাকপুবে বাস করিতেন।

কলিকাতার নাম কেন এইরূপ হইল তাহা লইয়া নানা কথা প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, কালীঘাট বা কালীক্ষেত্র শব্দ হইতে কলিকাতা নাম আসিয়াছে। কেহ বলেন—জনৈক ইংরেজ একটি ঘেসেড়াকে জিজ্ঞাসা করে যে, এই স্থানের নাম কি? সে ব্যক্তি ভাষা না বুঝিয়া অনুমান করিল যে, কবে ঘাস কাটা হইয়াছে সাহেব বুঝি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে। সে বলিল, কাল কাটা! অর্থাৎ গতকালের কাটা! তাহা হইতে কলিকাতা (Calcutta) নামকরণ হইয়াছে। অনেকে বলেন, প্রাচীন 'কিলকিলা' শব্দ হইতে 'কলকাতা' ও পরে 'কলিকাতা' শব্দ আসিয়াছে।

কলিকাতার প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে আছে কালীঘাটের মন্দির, চিত্রেশ্বরীর মন্দির, সেণ্ট এ্যান গীর্জা, সেণ্ট জর্জ চার্চ।

পরে অবশ্য ইহাদের আবার সংস্কার করা হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, আর্মেনিয়ান গীর্জা, অগাষ্টীনিয়ান গীর্জা, টেঞ্চবিবির গীর্জা প্রভৃতি এখন লোপ পাইয়াছে।

প্রথম কলিকাতার সীমানা ছিল উত্তর-পশ্চিমে সুতানুটি হইতে গোবিন্দপুর এবং ভাগীরথী হইতে ধাপা অর্থাৎ ৫০৭৭ বিঘা জমি। তাহাই এখন বাড়িয়া ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নগরীতে পরিণত হইয়াছে।

প্রশ্ন

১। জবচার্ণক কে ছিলেন?

২। কোথায় তিনি কলিকাতার পত্তন করেন?

৩। কলিকাতা নাম হইল কেন?

৪। প্রাচীন কলিকাতার কি কি নিদর্শন আছে?

মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহ

জব চার্ণক জলা-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কলিকাতা শহর বসাইলেন। প্রায় তখন হইতেই ভারত হইল পরাধীন। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার জন্য কলিকাতায় অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই** ছিল প্রধান। তাই ইংরেজ ভারত ত্যাগের সময় কংগ্রেসের হাতে ভারত শাসনের ভার দিল। যিনি এই দলের নেতৃত্ব করিলেন, তাহার নাম **মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী**। তাবই নির্দেশ মত কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নাম না জানে এমন লোক, শুধু আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীতে কোন দেশেই আর পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে 'সত্যাগ্রহ' কথাটির নামও অনেকে জানে। মহাত্মা গান্ধী সারা জীবন যে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার নাম সত্যাগ্রহ। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধেও এই অস্ত্রই তিনি নানা ভাবে বার বার প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এই সত্যাগ্রহ কথাটির স্বৃষ্টি ভারতে হয় নাই, হইয়াছে ভারতবর্ষ হইতে অনেক দূরে, দক্ষিণ আফ্রিকায়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ভারত মহাসাগরের পশ্চিম কূলে আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত। ইহার শেষ সীমার দক্ষিণ-পূর্ব

উপকূল বিভাগের কয়েকটা অঞ্চল লইয়া এখন দক্ষিণ-অফ্রিকা ইউনিয়ন সরকার গঠিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহার অনেক আগেকার কথা বলিতেছি।



সত্যাগ্রহ আরম্ভের সময় ব্যারিষ্টার বেশে মহাত্মা গান্ধী

এইখানে নাটাল, ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেট, কেপ রাজ্য—এইগুলি ছিল ইংরেজ অধিকারে। এই সব জায়গায় ভাল চাষ-বাস হয় এবং সোনার খনি ও অন্যান্য শিল্পের সুবিধাও খুব।

ইংরেজেরা এই অঞ্চলে ব্যাবসা-বাণিজ্য করে। কিন্তু এই জায়গায় ভালভাবে ব্যবসা করিতে হইলে প্রচুব মজুরের দরকার। তাহা হইলে চাষ ভাল হয় এবং চা, কফি, আখ প্রভৃতি প্রচুব পরিমাণে জন্মিতে পারে। ভারত সরকারেব নিকট হইতে হাজাব হাজার দরিদ্র চাষীকে চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস কবিয়া ইংরেজ তাহাদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকায় লইয়া গেল। চুক্তিকালেব মধ্যে ইহাদিগকে পশুর মত খাটিতে হইত, চুক্তি ফুরাইলে কেহ ইচ্ছা হইলে ঐখানে থাকিতে পারিত, আবার কেহ চলিয়াও আসিতে পারিত।

এই শ্রেণীর কুলীব সংখ্যাই অধিক ছিল। তাহা ছাড়া বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের পার্শী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বড় বা ধনী ব্যবসায়ীর সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। তাহারাও ভাল রোজগার কবিত। হিন্দু কেরাণীও ছিল অনেক। মোট কথা নাটালে ইউরোপীয়গণ ছিল যখন ৪০ হাজার, তখন সবশ্রেণীর ভারতীয় লোকের সামগ্রিক সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। কাজেই যদি ভারতীয় লোক এই হিসাবে আসিতে থাকে, তবে ইংরেজদের আর সংখ্যাধিক্য ও প্রতিপত্তি থাকিবে না—এই আশংকা করিয়া তাহারা ভারতীয়দের তাড়াইবার নানা ফিকির ও ফন্দি আঁটিতে লাগিল।

উপরন্তু তাহারা এমন আইন প্রবর্ত্তন কারয়াছিল যে, সাহেবদের পাড়ায় ভারতীয়দের বাস করিববার কোনরূপ অধিকার রহিল না। সাহেবদের সহিত একই গাড়ীতে চলা কিংবা মেলা-মেশারও চলন রহিল না।

এই সময়ে সগু ব্যারিষ্টারী-পাশ-করা মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় এক ব্যবসায়ীব পক্ষে ব্যারিষ্টার হিসাবে নাতাল গেলেন। উহা ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। গান্ধীজীর বয়স তখন মাত্র ২৪ বৎসর। কিন্তু তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার রেলের প্রথম শ্রেণীতে চড়িতে গেলে, সেখানে সাহেবদের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হইল। তাহাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, 'কালা আদমীদের' উচু শ্রেণীতে চড়বার অধিকার নাই, এই ছলে গাড়ী হইতে তাঁহাকে নামাইয়া দেওয়া হইল। তিনি সারা রাত্রি শীতের মধ্যে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিলেন। ঐ দিনই তিনি তাঁহার কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, যে-প্রকারেই হোক ভারতীয়দের হীন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। তিনি বলেন, সেইদিন হইতেই সত্যাগ্রহ জন্ম নিল।

নাটালে বর্ণবিদ্বেষের জন্য নানাভাবে তিনি অপমানিত হইলেন, মার খাইলেন। কিন্তু ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎ বিপদ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভারতে ফিরিবার কথা ভুলিয়া, তিনি সেখানেই কাজে লাগিয়া গেলেন। ভারতীয় কংগ্রেসের অনুকরণে তিনি সেখানে নাটাল কংগ্রেস গঠন করিলেন।

ইহার পর নানাদিক হইতে ইউরোপীয় সমাজ ভারতীয়দের অধিকার ছলে বলে কৌশলে সংকুচিত করিতে লাগিলেন এবং ভারতীয়গণও প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। শেষে দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯০৬ সালে এশিয়াটিক আইন পাশ করা হইল।

ইহাকে গান্ধীজী সাতকী আইন বলিয়াছেন। কারণ ইহা দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীদের ইজ্জৎ, অধিকার সব নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। নাটালের একটি মসজিদে প্রায় দু'হাজার লোকের সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহাবা মরণপণ করিয়া এই শপথ করিল যে, তাহারা এই বিলের বিরোধিতা করিবে। গন্ধীজী তখন পরিকল্পনা কিসে জয়যুক্ত হইতে পারে উহাতে মনোনিবেশ করিলেন। আর এক সমস্যা হইল, এই আন্দোলনের কি নাম হইবে। একজন বলিল, ইহার নাম হউক **সদাগ্রহ।** শেষে গান্ধীজী শুদ্ধান্তে ইহার নাম দিলেন '**সত্যাগ্রহ**'। কথাটির অর্থ হইল সত্যের প্রতি আগ্রহ। সত্য অর্থ ন্যায়, সুতরাং ন্যায়ের দাবী প্রতিষ্ঠাব জন্য যে **অহিংস যুদ্ধ** হইবে, তাহাব নাম হইল সত্যাগ্রহ।

ক্রমে ক্রমে সত্য সত্যই অহিংসা যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। প্রথমে ভারতীয়রা আইনের সাহায্যে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। তারপর ঐ আইন অমান্য করিবার পরিকল্পনা স্থির হয়। দলে দলে ভারতীয়-গণ কারাবরণ করিতে লাগিল। তাহাতে কাহারও মনের বল বিন্দুমাত্রও কমিল না। তখন বাধ্য হইয়া সরকার মিটমাটের চেষ্টা করিল। অধিকাংশ ভারতীয়ের এই মিটমাটের পক্ষে মত ছিল বলিয়া তখনকার মত আন্দোলন বন্ধ হইল।

কিন্তু আবার সরকার হইতে ভারতীয়দের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ আফ্রিকায়

সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবল আকারে আরম্ভ হইল। ভারত হইতে গোপালকৃষ্ণ নিজে আফ্রিকায় গিয়া আন্দোলনের তত্ত্বাবধান করিলেন।

এবারের আন্দোলন অনেক দিন চলিবে মনে হইল। একদল সর্বত্যাগী কর্মীর দরকার হইল। ইহাদের ভরণপোষণের ব্যয় আছে; সেজন্য গান্ধীজী কর্মীদের লইয়া একটি বিরাট কৃষিক্ষেত্র গড়িয়া তুলেন। তাহারা সব কাজ ফেলিয়া এই কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিবে। যাহারা সত্যাগ্রহ করিয়া জেলে যাইবে, কৃষিক্ষেত্র হইতে তাহাদের পরিবারদিগকে সকল খরচ চালানো হইবে। এই কৃষিক্ষেত্রের নাম দেওয়া হইল '**টলষ্টয় কৃষিক্ষেত্র**'। টলষ্টয় ছিলেন রাশিয়ার মনীষী; তাঁর আদর্শের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও স্মৃতিরক্ষার জন্য ঐ নাম দেওয়া হইল।

ইহার পর আন্দোলন নূতনভাবে আরম্ভ হইল। ঠিক হইল ভারতীয়েরা দলে দলে পায়ে হাঁটিয়া সুদূর অঞ্চলে গিয়া সত্যাগ্রহ করিবে। পৃথিবীতে রাজনৈতিক আন্দোলনে এইভাবে হাজার হাজার লোক শত শত মাইল হাঁটিয়া আন্দোলন করিতে যাওয়া এই প্রথম। গান্ধীজী ইহার নাম দিলেন **মহা অভিযান**। অতঃপর দেখিতে দেখিতে খনির শ্রমিকদের সহিত মালিকদের ঝগড়া হইল। তাহারাও দলে দলে এই আন্দোলনে যোগ দিল। এই আন্দোলনের সাফল্য দেখিয়া সরকার একটু নরম হইল।

এই আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। শেষে আট বৎসর অহিংসা যুদ্ধের পর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে

একটি নিরপেক্ষ কমিশন নিয়োগ করা হয়, এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় আইনের নানা অংশ পারবর্তন ও রহিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এইভাবে প্রথম পর্য্যায়ের সত্যাগ্রহ সংগ্রাম দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে জন্মগ্রহণ করে এবং পরীক্ষিত হইয়া জয়লাভ করে।

অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকারের যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু প্রথম যুদ্ধে তাঁহারা জয়ী হইয়াছিলেন এবং আমাদের কোন সন্দেহ নাই যে, চলিত যুদ্ধেও তাঁহারা জয়ী হইবেন।

প্রশ্ন

১। সত্যাগ্রহ প্রথম কোথায় প্রয়োগ হয় এবং কেন ?

২। সত্যাগ্রহ কথার অর্থ কি ?

৩। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ আন্দোলন করিল কেন এবং কাহাদের বিরুদ্ধে ?

৪। কিভাবে আন্দোলন হইল ?

৫। কিভাবে আন্দোলনের নিষ্পত্তি হইল ?